৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০৫

টপিক:
প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ, বাগ্‌ধারা।
গ্রন্থ-সমালোচনা-১: (বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা, শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত গ্রন্থ/তাঁকে নিয়ে লিখিত গ্রন্থের সমালোচনা, ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত গ্রন্থের সমালোচনা, উপন্যাস, গল্প, কবিতাগ্রন্থ ও অন্য সবগুলো)

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর = মিথ্যাবাদিরা বেশি কথা বলে।
- অতি দর্পে হত লঙ্কা = অহংকারে পতন অবশ্যম্ভাবী।
- আরশির মুখে পড়শিকে দেখে = নিজে যেমন, অন্যকেও তেমনই ভাবা।
- এরেন্ডোহপি দ্রুমায়তে = প্রকৃত গুণীর অভাবে স্বল্প যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিও অনেক খাতির পায়।
- ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাইনি = বোকামি করে নিজের দোষ স্বীকার করে ফেলা।
- ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয় = ভাগ্যবান লোকেরা কোথাও আটকায় না।
- অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী = কম জানার ফলাফল বিপজ্জনক।
- আঠারো মাসে বছর = দীর্ঘসূত্রতা।
- আদার বেপারির জাহাজের খবর = সাধারণ ব্যক্তির অহেতুক বড় কোনো বিষয়ে চিন্তা করা।
- আলালের ঘরের দুলাল = ধনীর আদুরে সন্তান।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- এরেন্ডাও গাছ, পুঁটি মাছও মাছ = যোগ্য ব্যক্তির অভাবে সামান্য ব্যক্তিও কর্তা হতে পারে।
- খাল কেটে কুমির আনা = বিপদের পথ সুগম করা।
- গেঁয়ো যোগি ভিখ পায় না = যোগ্য প্রতিবেশীর কদর কম।
- ছাই ফেলতে ভাঙা কুলা = অবহেলার বস্তু, কিন্তু প্রয়োজনে কদর পায়।
- ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় = ভালো ব্যক্তি পাওয়াই মুশকিল।
- ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে = অভ্যাস বদলানো কঠিন।
- দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো = অসৎ সঙ্গী থাকার চেয়ে সঙ্গীহীন থাকাই ভালো।
- বসতে দিলে শুতে চায় = একটু সুযোগ দিলে মাথায় চড়ে বসার প্রত্যাশা।
- মরা হাতি লাখ টাকা = প্রকৃত মূল্যবানের মর্যাদা কমে না।
- শাক দিয়ে মাছ ঢাকা = দোষ এড়ানোর জন্য ঠুনকো অজুহাত দাঁড় করানো।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- মোগল পাঠান হদ্দ হল ফারসি পড়ে তাঁতী = অভিজ্ঞ লোকেরা যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে না সে ধরনের কাজে অনভিজ্ঞ লোকের প্রচেষ্টা নিতান্ত হাস্যকর।
- ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা = আকাশ কুসুম কল্পনা করা।
- উজার বনে শিয়াল রাজা = উপযুক্ত লোকের অভাবে অপদার্থের ক্ষমতা লাভ।
- অতি দানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই = অতিরিক্ত সততা অবলম্বন করে দান বা সৎ কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির অন্যের কৌশলে ভোগান্তির শিকার হওয়া।
- অতি মন্থনে বিষ ওঠে = একটি বিষয় নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত আলোড়ন ক্ষতিকারক হয়।
- অন্ধের হাতি দেখা = কোনো বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা না নিয়ে শুধু অংশ বিশেষ পর্যালোচনা করে সম্পূর্ণ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা।
- আগ নাংলা যে দিকে যায় পাছ নাংলা সেদিক যায় = অন্ধভাবে কাজের অনুকরণ।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- কুরুক্ষেত্র কাণ্ড = ভীষণ ঝগড়াঝাটি, তুমুল কাণ্ড, মহাকলহ।
- খাঞ্জা খাঁ = নবাবী চালচলন, দিলদরিয়া ভাব।
- গজ কচ্ছপের লড়াই = প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা দুই প্রবল পক্ষের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ।
- ত্রিশঙ্কু অবস্থা = অনিশ্চিত অবস্থায় পড়া ব্যক্তির দশা।
- ধন্বন্তরি = দক্ষ ডাক্তার, অব্যর্থ ঔষধ।
- নরাণাং মাতুল ক্রম = মামার গুণ পায় ভাগ্নে/মামার অনুসরণকারী।
- পিপুফিশু = কুঁড়ের বাদশা।
- ভাগের মা গঙ্গা পায় না = কাজ ভাগাভাগি করলে তা প্রায়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না বা পণ্ড হয়ে যায়।
- ভেড়াকান্ত = বোকার সেরা।
- শনির দশা = চরম দুর্দশা / অতি দুঃসময়।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- হরি ঘোষের গোয়াল = বহু বেকার লোকের আড্ডা।
- চিত্রগুপ্তের খাতা = স্বচ্ছ ও নির্ভুল হিসাব।
- শিখণ্ডী খাড়া করা = আড়ালে থেকে অন্যায় কাজ করা।
- কানে দিয়েছি তুলো আর পিঠে বেঁধেছি কুলো = নিতান্তই বেহায়া।
- খিড়কি দোরে হাতি গলে, সদরে বাঁধে ছুঁচ = একদিকে সামান্য সাবধান হতে গিয়ে অন্যদিকে ক্ষতি পোহানো।
- ঘরামির ঘর ছেঁদা = অন্যের স্বার্থ দেখতে গিয়ে নিজের স্বার্থ না ভাবা।
- ঢাকের দায়ে মনসা বিকোয় বিকোয় = আড়ম্বরের চোটে আসল কাজ নষ্ট।
- পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে = নাছোড়বান্দা লোকের কথায় সায় দিতে বাধ্য হওয়া।
- বাপের কালে নেইকো চাষ, ধানকে বলেন দুর্বা ঘাস = কিছু না জানা সত্ত্বেও জানার ভান করতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হওয়া।
- অতি চালাকের গলায় দড়ি = বেশি চালাকি করলে বিপদে পড়তে হয়।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট = বেশি মাতব্বর থাকলে কাজের উদ্দেশ্য বিফলে যায়।
- অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায় = ভাগ্য খারাপ হলে কোনোকিছুতেই ভরসা থাকে না।
- অসারের তর্জন গর্জন সার = অধমকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না।
- এক ক্ষুরে মাথা কামানো = একই মতের/আদর্শের অনুসারী।
- কপালগুণে গোপাল ঠাকুর = ভাগ্যগুণে যোগ্যতাহীন ব্যক্তিও সম্মানিত হয় ওঠে।
- গাছে তুলে মই কাড়া = আশ্বাস দিয়ে প্রতারণা করা।
- চোখ থাকতে কানা = দৃষ্টি আছে কিন্তু জ্ঞান নেই।
- চোরের উপর বাটপারি = ঠগকে ঠকানো।
- ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা = সামান্য কাজের জন্য দায় নেওয়া।
- জ্বলন্ত আগুনে ঘি দেওয়া = উসকে দেওয়া।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ = সাংসারিক সকল কাজ।
- ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার = অযথা বাহাদুরি।
- তিল কুড়িয়ে তাল = ছোট ছোট সঞ্চয় থেকে বড় কিছু তৈরি করা।
- দশচক্রে ভগবান ভূত = অনেকের চাপে পড়ে ন্যায় কে অন্যায় বানানো।
- দুধের সাধ ঘোলে মিটে না = প্রকৃত বস্তুর প্রয়োজন নকলে মেটে না।
- ধান ভানতে শীবের গীত = অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা।
- নাচতে নেমে ঘোমটা দেয়া = অহেতুক ন্যাকামো প্রদর্শন।
- বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো = অতি সাবধানীর বিপদের আশঙ্কা বেশি।
- বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা = বিপজ্জনক পরিবেশের শিকার হলে বিচিত্র সংকট দেখা দেয়।
- ভূতের বেগার খাটা = অপ্রয়োজনে অন্যের কাজ করা।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- যার জন্য করি চুরি সে বলে চোর = উপকার করে নিন্দা পাওয়া।
- রতনে রতন চেনে = একই জাতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
- শিকারি বেড়াল গোঁফে চেনা যায় = আচরণই বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।
- হোঁচট খেলে পথ চেনা যায় = কোথাও ঠেকলে মানুষের শিক্ষা হয়।
- যার লাঠি তার মাটি = কর্মঠ ব্যক্তি জীবন-যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করে।
- পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর = নগণ্য লোকের গুরুত্বপূর্ণ খবর রাখা।
- ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচ = লজ্জার ভাব দেখিয়ে নির্লজ্জ আচরণ।
- কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো = জোর করে কাজের উপযোগী করা।
- দেশের কুকুর বিদেশের ঠাকুর = দেশের লোকের চেয়ে আপন আর কেউ হতে পারে না।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- অরণ্যে রোদন – নিষ্ফল আবেদন।
- অকাল বোধন = অসময়ে আবির্ভাব।
- অগ্নিশর্মা = অতিশয় ক্রুদ্ধ।
- অকাল কুষ্মাণ্ড = অপদার্থ, অকেজো।
- অন্তর টিপুনি = অলক্ষ্যে অন্যের মনে ব্যথা দেওয়া।
- অঘটন-ঘটনপটীয়সী = অসাধ্য সাধনে পটু।
- আঁধার ঘরের মানিক = অতি প্রিয়।
- আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া = দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তি।
- আক্কেল গুড়ুম = হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত।
- ইয়ার বকশী = রঙ্গরসপ্রিয় বন্ধু।
- ইঁদুর কপালে = নিতান্ত মন্দ ভাগ্য।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে = একের অপরাধে অপরকে দায়ী করা।
- উড়নচণ্ডী = অমিতব্যয়ী।
- উড়ে এসে জুড়ে বসা = অনধিকারীর অধিকার।
- এসপার ওসপার = মীমাংসা
- এক গোয়ালের গরু = সমশ্রেণির।
- কালনেমির লঙ্কাভাগ = দুর্লভ বস্তু লাভের আগে তা উপভোগ করার অলীক কল্পনা।
- কানাকড়ির সম্পর্ক = তুচ্ছ সম্পর্ক।
- কাঠের পুতুল = জড় পদার্থ।
- কাষ্ঠ হাসি = কপট হাসি।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- কাঁঠালের আমসত্ত্ব = অসম্ভব বস্তু।
- কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন = যার যে গুণ নেই, সে গুণের ভান করা।
- কেবলা হাকিম = অনভিজ্ঞ।
- কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা = কৈশোরে নষ্ট হওয়া।
- কল্কে পাওয়া = পাত্তা পাওয়া।
- কইয়ের তেলে কই ভাজা = অন্যের ওপর দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার।
- কাছা ঢিলা = অসাবধান।
- কুম্ভকর্ণের নিদ্রা = দীর্ঘদিনের আলস্য।
- কেষ্ট-বিষ্টু = বিশিষ্ট ব্যক্তি।
- কালেভদ্রে = কদাচিৎ।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- খণ্ড প্রলয় = তুমুল কাণ্ড।
- খোদার খাসি = হৃষ্টপুষ্ট।
- গৌরচন্দ্রিকা = ভণিতা।
- গজেন্দ্র গমন = মৃদু মন্থর গমন।
- গোঁয়ার গোবিন্দ = কাণ্ডজ্ঞানহীন।
- গুরুমারা বিদ্যে = অর্জিত বিদ্যা দিয়েই বিদ্যাদানকারীকে জব্দ করা।
- গৌরী সেনের টাকা = বেহিসাবি অর্থ।
- গোঁফখেজুরে = নিতান্ত অলস।
- গোবরে পদ্মফুল = নীচ কুলে মহৎ ব্যক্তি।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- ঘাটের মড়া = অতি বৃদ্ধ।
- ঘটিরাম = অপদার্থ, অযোগ্য।
- ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া = শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের অতিক্রম করে ফল লাভের চেষ্টা।
- চশমখোর = চক্ষুলজ্জাহীন।
- চিনির পুতুল = যে অল্প পরিশ্রমে ভেঙে পড়ে।
- চোখের বালি = বিশেষ বিরক্তির বস্তু।
- চামচিকের লাথি = নগণ্য ব্যক্তির কটূক্তি।
- চর্বিতচর্বণ = পুনরাবৃত্তি।
- ছাই ছাপা আগুন = প্রচ্ছন্ন যোগ্যতা।
- ছেলের হাতের মোয়া = সহজ প্রাপ্য।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- জাহান্নামে যাওয়া = কুপথে যাওয়া।
- জগাখিচুড়ি = বিশৃঙ্খলা।
- জগদ্দল পাথর = কঠিন চিন্তা।
- টইটুম্বুর = পরিপূর্ণ।
- টুপ ভুজঙ্গ = নেশায় ভরপুর।
- ঠুঁটো জগন্নাথ = দায়িত্বহীন অকর্মণ্য ব্যক্তি।
- ঢেঁকির কচকচি = বিরক্তিকর কথা।
- ঢিমে তেতালা = অতিশয় মন্থর গতি।
- তীর্থের কাক = লোভের প্রতীক্ষাকারী।
- তুলসি বনের বাঘ = ভণ্ড।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- তাসের ঘর = ক্ষণস্থায়ী।
- তুই তোকারি করা = তুচ্ছভাবে সম্বোধন করা।
- তক্কে তক্কে থাকা = গোপনে সতর্ক থাকা।
- দুর্বা গজানো = অত্যন্ত কুড়ে।
- দহরম-মহরম = মাখামাখি।
- দুধের মাছি/বসন্তের কোকিল = সুসময়ের বন্ধু।
- ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির = সত্যবাদী।
- নগদ নারায়ণ = নগদ অর্থ।
- ননীর পুতুল = কোমল দেহ।
- নিশপিশ করা = অস্থির হওয়া।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- পর্বতের মূষিক প্রসব = বেশি প্রত্যাশায় সামান্য প্রাপ্তি।
- পুঁটি মাছের প্রাণ = যা সহজে মরে যায়।
- পাকা ধানে মই = অনিষ্ট করা।
- পালের গোদা = সর্দার।
- পরের ধনে পোদ্দারি = অপরের অর্থ যথেচ্ছ ব্যয়।
- ফপর দালালি = অনাবশ্যক মাতব্বরী।
- বাড়া ভাতে ছাই = উৎকৃষ্ট বস্তু নষ্ট।
- বিনা মেঘে বজ্রপাত = হঠাৎ বিপদ।
- বিষ নয়নে পড়া = বিরাগভাজন হওয়া।
- বক ধার্মিক = ভণ্ড ধার্মিক।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- ব্যাঙের আধুলি = সামান্য ধনে অহংকার।
- বামন হয়ে চাঁদে হাত = অসম্ভব আশা পোষণ করা।
- বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া = আকস্মিক সুযোগ লাভ।
- বিন্দু বিসর্গ = সামান্য অংশ।
- ভিজা বিড়াল = কপটচারী।
- ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ = বাজে কাজে অর্থ ব্যয় করা।
- ভিটেয় ঘুঘু চড়ানো = যথাসর্বস্বের ক্ষতিসাধন।
- মগের মুল্লুক = অরাজকতা।
- মানিকজোড় = নিবিড় বন্ধুত্ব।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- মাকাল ফল = অন্তঃসারশূন্য।
- মণিকাঞ্চন যোগ = শুভ সংযোগ।
- মেছো হাট = তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যে স্থান মুখরিত।
- যমের দোসর = নিষ্ঠুর ব্যক্তি।
- যক্ষের ধন = কৃপণের ধন।
- যবনিকাপাত = অবসান।
- যত গর্জে তত বর্ষে না = আশানুরূপ হয় না।
- রাশভারী = গম্ভীর।
- রাবণের চিতা = চির অশান্তি।
- রগচটা = বদমেজাজী।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- রক্তের টান = স্বজনপ্রীতি।
- লগন চাঁদা = ভাগ্যবান।
- লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না = লঘু শাসনে যে বশ মানে না।
- শিরে সংক্রান্তি = আসন্ন বিপদ বা সমূহ বিপদ।
- ষাটের কোলে = অধিক বয়স।
- ষোল কড়াই কানা = সব ফাঁকি।
- সোনার পাথর বাটি = অসম্ভব বস্তু।
- সবেধন নীলমণি = একমাত্র অবলম্বন।
- সাক্ষীগোপাল = কর্তৃত্বহীন দর্শক মাত্র।

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা

- হাড়ে বাতাস লাগা = শান্তি।
- হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা = হেলায় সুযোগ নষ্ট করা।
- হাতে না মেরে ভাতে মারা = পরোক্ষ শাস্তি দেওয়া।
- হাটে হাঁড়ি ভাঙা = গোপন কথা প্রকাশ।
- হরিষে বিষাদ = সুখে দুঃখানুভব।
- হাড়ে দুর্বা গজানো = অত্যন্ত কুড়ে।
- হাত দিয়ে হাতি ঠেলা = অসম্ভব কার্যকে সম্ভব করার চেষ্টা।
- হস্তীমূর্খ = বোকা।
- হোমরা চোমরা = প্রতিপত্তিশালী লোক।

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

কী কী ধরনের বই নিয়ে সমালোচনা লিখতে দিতে পারে:

- মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক উপন্যাস/কাব্যগ্রন্থ/স্মৃতিকাহিনি/নাটক
- ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস/নাটক/প্রবন্ধগ্রন্থ
- বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক/লোকসাহিত্যনির্ভর কোনো গ্রন্থ
- আঞ্চলিক উপন্যাস/রূপক-সাংকেতিক নাটক/আত্মজীবনী ইত্যাদি
- বহুল পরিচিত সুনির্দিষ্ট গ্রন্থ; যেমন: ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, ‘কারাগারের রোজনামচা’, ‘আমার দেখা নয়াচীন’ ইত্যাদি।

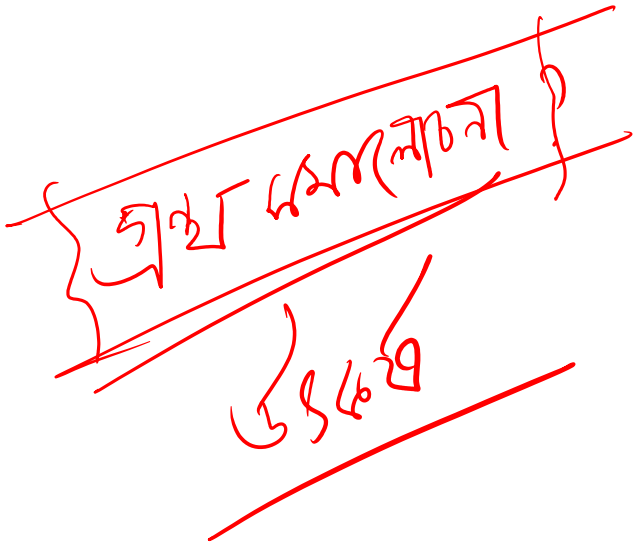

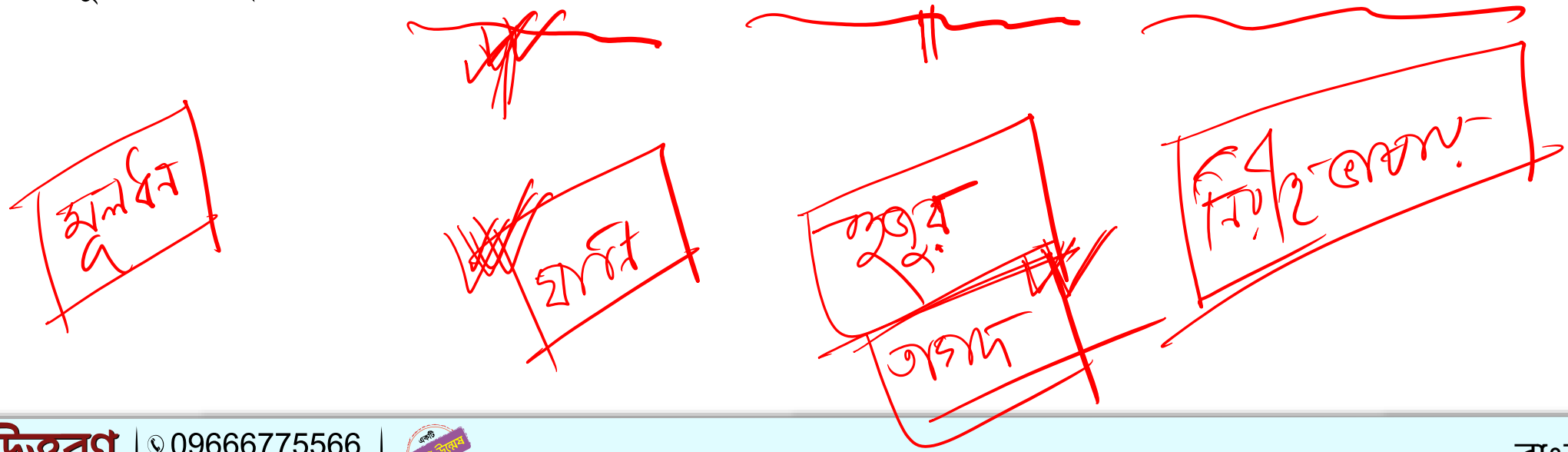

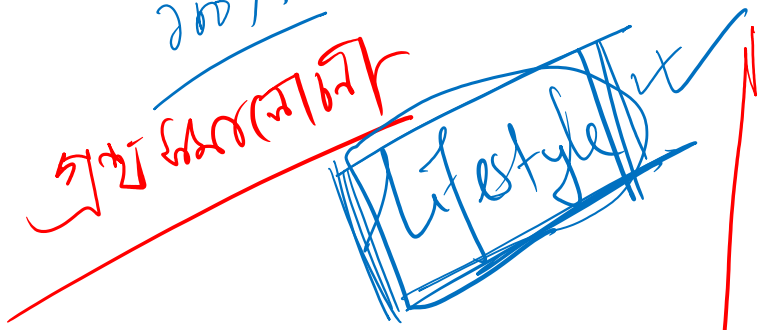

১০০%

গ্রন্থ সমালোচনা

Lifestyle

শিরোনাম

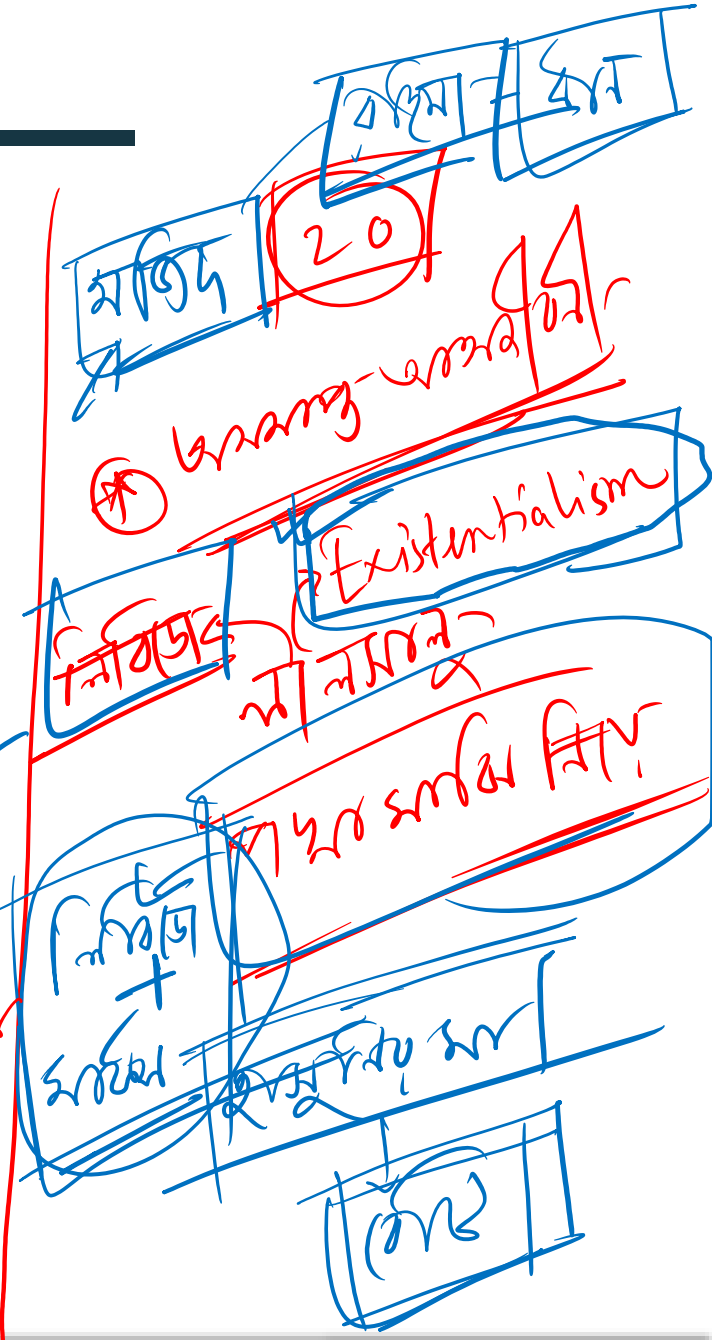

১ম → গ্রন্থের পরিচয়
২য় → লেখকের পরিচয়
৩য় → গ্রন্থের প্রেক্ষাপট
৪র্থ → গ্রন্থের বিষয়বস্তু / মূলপর্ব
৫ম → দেশ, সমাজ, জীবন / মতবাদ
৬ষ্ঠ → তুলনা
৭ম → নামকরণ, চরিত্র, বিষয় উপস্থাপন
সংলাপ
৮ম → গ্রন্থটির গুরুত্ব

মজিদ
২০
অসমাপ্ত আত্মজীবনী
Existentialism
লালসালু

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

পরীক্ষায় উত্তর করার ক্ষেত্রে সময়কে বিবেচনায় রাখতে হবে। মোটামুটি ১৫ থেকে ১৮ মিনিটের মধ্যে গ্রন্থ-সমালোচনা লেখা শেষ করতে হবে। পুরো উত্তরকে কয়েকটি ছোট ছোট অনুচ্ছেদে ভাগ করে নেবেন। প্রথমে একটি শিরোনাম এবং সারসংক্ষেপ দিয়ে শুরু করবেন। যেমন:

‘একাত্তরের দিনগুলি’: হৃদয়ের রক্তক্ষরণ

গ্রন্থের নাম: ‘একাত্তরের দিনগুলি’

লেখক: জাহানারা ইমাম

প্রকাশকাল:

প্রকাশনী:

প্রচ্ছদশিল্পী:

পৃষ্ঠাসংখ্যা:

শিরোনামের নিচে গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম লিখবেন। প্রথম প্রকাশকাল জানা থাকলে লিখবেন। তবে প্রচ্ছদশিল্পী, প্রকাশনী ও পৃষ্ঠাসংখ্যা না লিখলেও হবে।

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

১ম অনুচ্ছেদ: এ অংশে ১-২ বাক্যে গ্রন্থটির সাধারণ পরিচয় নিয়ে লিখবেন। যেমন: 'একাত্তরের দিনগুলি' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ। এটি দিনলিপির আকারে লেখা।

২য় অনুচ্ছেদ: এ অংশে লেখক সম্পর্কে লিখবেন। তাঁর অন্য কোনো বইয়ের নাম জানা থাকলে লিখবেন। লেখকের জন্ম-মৃত্যু সাল জানা না থাকলে অন্তত সময়কাল সম্পর্কে লিখবেন। লেখকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে লিখবেন। এককথায়, লেখক সম্পর্কে লিখবেন কমবেশি ৩ বাক্যে। যেমন: জাহানারা ইমামের বিশেষ খ্যাতি 'একাত্তরের দিনগুলি'র জন্য। তিনি শহিদজননী হিসেবে খ্যাত। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি আজীবন ছিলেন সোচ্চার।

৩য় অনুচ্ছেদ: এ অংশে গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থ রচনার কারণ বা উদ্দেশ্য, গ্রন্থের বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সম্পর্কে লিখতে হবে। যেমন: দিনলিপি জাতীয় গ্রন্থে লেখক দিনের বিবরণ দিয়ে থাকেন। 'একাত্তরের দিনগুলি' গ্রন্থে লেখক একাত্তরের শ্বাসরুদ্ধকর সময়কে তুলে এনেছেন। দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনার অনিবার্য পরিণতি ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে উত্তাল হতে থাকে পূর্ব বাংলা। জাহানারা ইমাম তারিখ দিয়ে সেসব দিনের কাহিনি ও তথ্য তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধে দেশের পরিস্থিতি, মানুষের ভীতি ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি। এভাবে ৪-৫ বাক্য লিখতে হবে।

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

৪র্থ অনুচ্ছেদ: গ্রন্থের কাহিনি, চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে লিখতে হবে। এ অংশের সফলতা নির্ভর করে গ্রন্থ-পাঠের ওপর। অনেক গ্রন্থের ভূমিকা পড়েও এ অংশ ভালো লেখা যায়। একটি গ্রন্থ সম্পর্কে যত তথ্য জানা যায়, তত সুন্দর করে এই অনুচ্ছেদ লেখা যায়। এ অংশের নির্দিষ্ট আয়তন নেই। যেমন: 'একাত্তরের দিনগুলি' সরাসরি পড়া থাকলে লেখা সহজ হয় এখানকার রুমী চরিত্রটি কেমন, তার কী ভূমিকা, গ্রন্থে আর কোন কোন চরিত্র আছে। গ্রন্থের কাহিনি, বিষয়, সংলাপ এগুলোও আলোচনায় আসবে।

৫ম অনুচ্ছেদ: সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় মানুষের জীবন, অনেক সময় লেখক সুনির্দিষ্টভাবে কোনো মতবাদের প্রয়োগ ঘটান। এর বাইরেও আরও অনেক রকম লক্ষ্য বা আঙ্গিক-বৈচিত্র্য থাকে। এর সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থকে সংশ্লিষ্ট করা গেলে করতে হবে। যেমন: মার্ক্সবাদ, প্রেমম-লক, কল্পকাহিনি, আঞ্চলিক কাহিনি, আত্মজীবনী ইত্যাদি।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ: এ অংশে তুলনার কাজটি করতে হবে। যেমন: অনুরূপ বিষয় নিয়ে আর কোন কোন সাহিত্য রচিত হয়েছে, এর কিছু নমুনা দিতে হবে। একই গ্রন্থের কিংবা অন্য কোনো গ্রন্থের কোনো চরিত্রের সঙ্গে মেলানো যায় কি না, দেখতে হবে। আয়তন হতে পারে কমবেশি ৩ লাইন।

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

৭ম অনুচ্ছেদ: গ্রন্থের নামকরণের কারণ, বিষয় উপস্থাপনে বা চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের সফলতা-ব্যর্থতা বা কৌশল কিংবা অন্য যেকোনো ভালো-মন্দ দিকের মূল্যায়ন হবে এ অংশে।

৮ম অনুচ্ছেদ: সবশেষে কয়েকটি বাক্যে উল্লেখ করবেন গ্রন্থটির গুরুত্ব কোথায়।

সতর্কতা:

১. গ্রন্থের নামে ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করবেন।
২. একটি আকর্ষণীয় ও কাব্যিক শিরোনাম দেবেন।
৩. প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সম্পর্কে দু-চারটি তথ্য আগে থেকে জেনে রাখার চেষ্টা করুন।
৪. সময়ের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন।

রেফারেন্স: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক তারিক মনজুর এর লেখা, প্রথম আলো হতে সংগৃহীত।

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)

গ্রন্থের নাম	:	বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)	প্রকাশক	:	দে'জ পাবলিশিং
লেখক	:	নীহাররঞ্জন রায়	পৃষ্ঠা	:	৭৬৫
প্রথম প্রকাশ	:	১৯৪১	মূল্য	:	৪১০ টাকা

'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)' বইটি বাংলার প্রাচীন ইতিবৃত্তবিষয়ক শেষ বই। এই বইটিতে বাঙালির ইতিবৃত্ত ঘটনার চরম পরিণতিও ঘটেছে।

বইটির রচয়িতা অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১)। তিনি ছিলেন একাধারে ইতিহাসবিদ, সাহিত্য সমালোচক ও শিল্পকলা গবেষক। তিনি প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। এক সময় সাংবাদিকতাও করেছেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো- বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি, প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন, An Artist in life, Sanskrit Buddhism in Burma ইত্যাদি।

বইটিতে মোট ১৫ টি অধ্যায় রয়েছে। সমস্ত বইটির বিষয়বস্তু হচ্ছে বাঙালির দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, ধর্ম-কর্ম, সংস্কৃতি, ধনসম্পদ, কৃষ্টি, উৎসব, পার্বণ প্রভৃতি। বাঙালি জাতি কীভাবে ক্রমান্বয়ে আজকের বাঙালিতে পরিণত হলো, আদি বাঙালিরা কেমন ছিল, কোথা হতে বাঙালির উৎপত্তি, বাংলার ভূ-খণ্ড, নদনদী, পাহাড়, বন, খাল, বিল প্রভৃতি কীভাবে গড়ে উঠেছে, বাঙালির শরীরে কার কার রক্তের মিশ্রণ রয়েছে, আদিযুগের ভূমিব্যবস্থা, কৃষি পদ্ধতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য কেমন ছিল ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ রয়েছে গ্রন্থটিতে। বইটির পরিসর আদিযুগ হতে মুসলমান দ্বারা বাংলা বিজয় পর্যন্ত। এই সময়কার বাঙালির পূর্ণ বিবরণই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু।

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

গ্রন্থটিতে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত মত জোর করে প্রচারের চেষ্টা করেননি। তিনি পণ্ডিতদের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করে, নতুন যুক্তি দিয়ে, প্রমাণ দিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের কথা বাদ দিলে ভাষা ও সাহিত্যের দিক থেকে ও বাংলা সাহিত্যে এটি একটি অনন্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার গ্রন্থটিতে নতুন শব্দ চয়ন, নতুন পদ ও বাকভঙ্গি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কোথাও কোথাও তাঁর বিবরণ ও ভাষা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। শুধু বিষয় বস্তু নয় নামকরণের ক্ষেত্রেও লেখক পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থের নাম 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' বাংলার ইতিহাস নয়। অর্থাৎ গ্রন্থটি দেশের রাজা-বাদশা, রাজকর্মচারী, যুদ্ধবিগ্রহ, শাসন বিস্তার প্রভৃতির বর্ণনা দেওয়ার জন্য রচিত হয়নি এগুলোর বর্ণনা এসেছে মূলত ঘটনার পরিক্রমায়। মূলত গ্রন্থটিতে বাঙালির লোক-ইতিহাস, বাঙালি জাতির সমগ্র জীবনযাত্রার যথার্থ পরিচয় দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে।

এর আগেও বাঙালির ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা হলেও সেগুলো পূর্ণাঙ্গ ছিল না। যেমন: রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত (ইংরেজি ভাষায়) বাংলা ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে এবং সুকুমার সেন রচিত 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে বাঙ্গালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)" গ্রন্থটি রচিত হয়েছে বাঙালির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বর্ণনা করার জন্য।

গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র বলেছেন, "বিষয়বস্তু বৈচিত্র্য, আলোচনার বিস্তারে এবং দৃষ্টির গভীরতায় আর কোনো বই এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। উইলকিনস্, জোনস, কোলব্রুক প্রমুখ বিদেশি মনীষীদের জ্ঞানাভিযান, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা, রাজেন্দ্র লাল, হরপ্রসাদের গবেষণা এবং অক্ষয়কুমার, রাখাল দাস, রমেশচন্দ্র প্রভৃতির সাধনার ফল পরিণতি লাভ করেছে নীহাররঞ্জনের 'বাঙ্গালীর ইতিহাসে'। বস্তুত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থটি বাঙালির ইতিহাস জানার আকরগ্রন্থ হিসেবে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

অসমাপ্ত আত্মজীবনী

গ্রন্থের নাম	:	অসমাপ্ত আত্মজীবনী	ঘটনা প্রবাহ	:	১৯৩৫-৫৫ পর্যন্ত
লেখক	:	শেখ মুজিবুর রহমান	চলচ্চিত্রায়ন	:	চিরঞ্জীব মুজিব (নজরুল ইসলাম)
লেখার সময়	:	১৯৬৬-৬৯ সালে জেলে থাকার সময়।	প্রকাশকাল	:	১৮ জুন, ২০১২
ভূমিকা লেখেন	:	শেখ হাসিনা	প্রকাশক	:	ইউ পি এল
ইংরেজি অনুবাদক	:	অধ্যাপক ফকরুল আলম	পৃষ্ঠা	:	৩৩০
ইংরেজি নাম	:	The Unfinished memoirs.	মূল্য	:	২২০

শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মকথন ও আত্মস্মৃতির এক অনন্য দলিল 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। এ গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে নির্ভীক, আপসহীন শেখ মুজিবের ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ।

গ্রন্থটির লেখক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) প্ন তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক। বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার আপসহীন অবিসংবাদিত এ নেতা বাংলা সাহিত্যে রেখেছেন অসামান্য অবদান। তাঁর রচিত আরো দুটি গ্রন্থ হলো- কারাগারের রোজনামচা ও আমার দেখা নয়াচীন।

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা চারটি খাতা ২০০৪ সালে আকস্মিকভাবে তার কন্যা শেখ হাসিনার হস্তগত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখেছেন, "এ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন। ১৯৬৬-৬৯ সালে কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালে একান্ত নিরিবিলি সময়ে তিনি লিখেছেন।" কিভাবে বঙ্গবন্ধুর লেখালেখির শুরু সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়েই শুরু হয়েছে আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থটি। জেলে অন্তরীণ অবস্থায় বঙ্গমাতা বেগম মুজিবের অনুপ্রেরণায় নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া স্মরণীয় ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন তিনি। জেলে খাতা কলমও কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন বেগম মুজিব। গ্রন্থটিতে বংশ পরিচয়, জন্ম-শৈশব, কৈশোর, শিক্ষাজীবন, রাজনীতিতে প্রবেশের প্রেক্ষাপট, সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎকালীন অবস্থা সকলই ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছেন শেখ মুজিব।

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। লেখকের ভাষায়, **"আমার জন্ম এই টুঙ্গিপাড়ার শেখ বংশে।"** শৈশবে ভীষণ দুরন্ত ছিলেন শেখ মুজিব। কিন্তু নানান শারীরিক জটিলতায় বারবার বাঁধা আসে তার শিক্ষাজীবনে। কিন্তু থেমে থাকেননি তিনি। ১৯৩৮ সালের এক জনসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের সাথে সাক্ষাত হয় শেখ মুজিবের। তাদের সান্নিধ্যে রাজনীতিতে যোগদান করেন তিনি। পিতা তাঁকে সর্বদা অনুপ্রেরণা দিয়ে যেতেন। রাজনীতিতে পুত্রের প্রতি পিতার আদেশ ছিল, "Sincerity of purpose and honesty of purpose." টগবগে তরুণ মুজিবের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, মিছিলে যোগদান, জেলে যাওয়া এবং বাংলা ভাষার দাবিতে আমরণ অনশনের এক জ্বালাময়ী ইতিহাস ফুটে উঠেছে তাঁর আপন বাক্যে। দুর্ভিক্ষ, বিহার দাঙ্গা, দেশবিভাগ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড, যুক্তফ্রন্ট গঠন, পূর্ববাংলার রাজনৈতিক উত্থান পতন, কেন্দ্রীয়-প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অপশাসন, লাহোর প্রস্তাব, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন প্রভৃতি বিষয় এ গ্রন্থে নিখুঁত ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীর অধিকাংশ অধ্যায় জুড়েই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে শহীদ সাহেবের প্রভাব যে কতটা স্পষ্ট তা গ্রন্থটিতে স্পষ্ট। তবে ন্যায়-অন্যায় ও জাতীয় ইস্যুতে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বিরোধিতা করতেও দেখা গেছে। ১৯৪৬ এর নির্বাচনে নাজিমুদ্দিনের সাথে আপসের প্রশ্নে শহীদ সাহেবের নমনীয় অবস্থান দেখে বলেছিলেন- "আপস করার কোন অধিকার আপনার নেই। আমরা খাজাদের সাথে আপস করব না।" এছাড়া বাবা-মা স্ত্রী-সংসারের প্রতি সার্বক্ষণিক অনুরাগ ফুটে ওঠে তাঁর লেখায়। বেগম মুজিবের উদারতা এবং সর্বাত্মকভাবে স্বামীকে সহযোগীতার জন্য লেখক তাঁর লেখনিতে বারংবার তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। জেল জীবনের একাকিত্ব, অসহায়ত্ব, মতপার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সুনিপুণ বর্ণনা এবং গঠনগত বিশ্লেষণ বইটির প্রতিটি পাতায় অলংকৃত হয়েছে।

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে তাঁর ইসলাম প্রিয়তা সম্পর্কে বেশ তথ্য পাওয়া যায়। ভাসানীর সাথে এক জেলে থাকার বর্ণনায় তিনি বলেন– "মাওলানা সাহেবের সাথে আমরা তিনজনই নামাজ পড়তাম। মাওলানা সাহেব মাগরিবের নামাজের পরে কোরআন মজিদের অর্থ করে আমাদের বোঝাতেন। রোজই এটা আমাদের জন্য বাঁধা নিয়ম ছিল।" কবি আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। লাহোরে থাকা অবস্থায় একবার তার বাড়িতে গেলে বঙ্গবন্ধু বলেন– 'কবি এখানে বসেই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আল্লামা শুধু একজন কবি ছিলেন না, একজন দার্শনিকও ছিলেন। আমি প্রথমে তাঁর মাজার জিয়ারত করতে গেলাম এবং নিজেকে ধন্য মনে করলাম।" স্বাধিকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু মাওলানা আকরাম খাঁ এর 'আজাদ', আবুল হিশামের 'মিল্লাত', আবুল মনসুর আহমদের 'ইত্তেহাদ', ভাসানীর উদ্যোগে মানিক মিয়ার 'ইত্তেফাক' প্রভৃতি পত্রিকার অবস্থান জোরালোভাবে চিত্রিত করেছেন।

একজন মহামানবের জীবনের প্রতিটি কাহিনি, প্রতিটি গল্পই মূল্যবান। সেই তুলনায় বইটিতে জাতির জনকের জীবনের একটি অংশের বর্ণনা আমরা পাই। আর লেখা শুরু করলেও লেখক এটি শেষ করে যেতে পারেননি। তাই এর নামকরণ "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" যথাযথভাবেই সার্থকতা পেয়েছে। রাজনীতির কবি হিসেবে খ্যাত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুখের ভাষার মতোই বইটির ভাষারীতি অত্যন্ত সহজ, সুন্দর এবং সাবলীল। গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধু শব্দ আর বাক্য ব্যবহারে পাণ্ডিত্য কিংবা উপমা, রূপকের ব্যবহারে চমৎকারিত্ব ফুটিয়ে তোলার কোনো চেষ্টা করেননি, জ্ঞানগর্ভমূলক বা কোন উপদেশ বাণী দেওয়ার চেষ্টাও করেননি। তবুও গ্রন্থটি মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়তে হয়। অত্যন্ত সহজ ও নির্লিপ্ত ভাষায় পুরো ঘটনা প্রবাহ তিনি লিখে গেছেন। কিছু জায়গায় ঘটনার প্রয়োজনে কিছু আবেগতাড়িত কথাবার্তা লিখেছেন। পরিশেষে একজন সমালোচকের দৃষ্টিতে বলা যায়। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে শেখ মুজিবুর রহমান জীবনে যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং রাজনৈতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সবই সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই সংগ্রাম, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের মহিমা থেকে যে সত্য জানা যাবে তা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের বিচারে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কে তুলনা করা যায় এপিজে আবুল কালাম আজাদের 'Wings of Fire' এর সাথে। কাহিনি বিচার বিশ্লেষণে অনুধাবন করা যায় যে এটি কেবল আত্মজীবনীই নয় বরং রাজনৈতিক গ্রন্থ হিসেবেও এটি অমূল্য।

সর্বোপরি বলতে হয়, শেখ মুজিব জীবনে যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং রাজনৈতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তার সবই সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাই বলা যায়,

"বাঙালিকে জানতে হলে
শেখ মুজিবকে জানতে হবে।"

আর শেখ মুজিবকে জানতে হলে, তাঁর লেখা অসামান্য সাহিত্য কর্ম 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পড়তে হবে।

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

আরেক ফাল্গুন

গ্রন্থের নাম	:	আরেক ফাল্গুন	প্রকাশকাল	:	১৯৬৯
লেখক	:	জহির রায়হান	প্রকাশক	:	অনুপম প্রকাশনী
বিষয়	:	ভাষা আন্দোলন	পৃষ্ঠা	:	৭২
ঘটনা প্রবাহ	:	তিন দিন ও দুই রাত	মূল্য	:	১২০ টাকা
চরিত্র	:	নায়ক মুনিম, আসাদ, সালমা			

'আরেক ফাল্গুন' ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম উপন্যাস যা ১৯৫৫ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি পালনের প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে রচিতপ্ম এর কাহিনিতে প্রকাশ পেয়েছে ভাষা আন্দোলনের বহুবিধ ঘটনার বর্ণনা এবং তার সাথে জড়িত অন্যান্য প্রসঙ্গপ্ম

উপন্যাসটির রচয়িতা বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র 'জহির রায়হান (১৯৩৩ – ১৯৭২)। তিনি ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাংবাদিক। এছাড়াও তিনি একজন ভাষা সংগ্রামী এবং মুক্তিযোদ্ধা। প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল এই লেখক শিল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনা হলো-- শেষ বিকেলের মেয়ে, হাজার বছর ধরে, আরেক ফাল্গুন, বরফগলা নদী, তৃষ্ণা, আর কতদিন, কয়েকটি মৃত্যু, সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়া তিনি বিখ্যাত চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারি পরিচালনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারি হলো- কখনো আসেনি, কাঁচের দেয়াল, সঙ্গম, বেহুলা, আনোয়ারা, জীবন থেকে নেওয়া, লেট দেয়ার বি লাইট, স্টপ জেনোসাইড, এ স্টেট ইজ বর্ন ইত্যাদি।

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক প্রথম উপন্যাসপ্ম এ উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯৬৯ হলেও এটিতে ১৯৫৫ সালের ঘটনাবলির বর্ণনা আছেপ্ম উপন্যাসের ঘটনাধারার মূল স্রোত ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে বাঙালি জীবনে যে আন্দোলনের ধারার সৃষ্টি হয়েছিল তা উপস্থাপন করে।

এ উপন্যাসের স্থিতিকাল অতি অল্প, মাত্র তিন দিন দুই রাতের ঘটনাবলি নিয়ে এ উপন্যাস নির্মিতপ্ম তবে বিভিন্ন চরিত্রের স্মৃতিচারণার ভেতর দিয়ে অতীতের ঘটনাধারা আসার কারণে এর ভেতরে দীর্ঘকালীন ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়প্ম অতীতের বৃটিশ মেরিনের সেপাহীর ছাউনি ফেলার কাহিনির বর্ণনা উপস্থাপনের মাধ্যমে উপন্যাসের সূচনা হয়েছেপ্ম প্রথম দুই-দিন ও দুই রাত চলেছে একুশ পালনের বিরামহীন প্রস্তুতিপ্ম তৃতীয় দিনে কাহিনির চূড়ান্তকালে ছাত্রদের মিছিল এবং পুলিশের সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে সময় অতিক্রান্ত হয়েছেপ্ম দিনের শেষে জেলগেটের ঘটনার ভিতর দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছেপ্ম একশ বছর আগের ১৮৫৭ সালের কাহিনির অবতারণার ভেতর দিয়ে উপন্যাসে প্রবেশ করেছেন ঔপন্যাসিকপ্ম বৃটিশ মেরিনো সেপাহীর নির্মমতার সাথে সম্পৃক্ত করে লেখক ভিক্টোরিয়া পার্কের সংযোগ স্থাপন করে মূল উপন্যাস শুরু করেনপ্ম এ পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুনিমপ্ম মুনিমের বর্ণনার ভেতরে এসেছে প্রতিবাদের প্রথম প্রতিফলনপ্ম মুনিমের পায়ে জুতো ছিলো না, খালি পায়ে সে নবাবপুরের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলপ্ম তার বেশভুষাতে আভিজাত্য থাকলেও সে জুতোহীন কারণ তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে ভাষার দাবিতেপ্ম

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

ভাষা আন্দোলনের নানা স্মৃতি ইতিহাসের মতো করে এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছেপ্ম হাইকোর্টের মোড়ে তিন বছর আগে গুলি খেয়ে মারা যাওয়া ছেলেটির কথা, বরকতের মৃত্যুর প্রসঙ্গ, বুড়ো ইমামের মোনাজাতের কথা, পাকিস্তানিদের অত্যাচারের বর্ণনা এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছেপ্ম বিশেষভাবে আছে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর কর্ম-তৎপরতার বর্ণনাপ্ম ভাষা আন্দোলনের সময়ে প্রথম শহীদ মিনার কীভাবে গড়ে উঠেছিল তারও নানা বিবরণ রয়েছে আরেক ফাল্গুনেপ্ম

মুনিমের বর্ণনার সূত্রধরে এসেছে আসাদের বর্ণনাপ্ম আসাদের পায়েও জুতো নেইপ্ম নগ্ন পায়ে সেও এগিয়ে যায় মুনিমের সাথেপ্ম এই আসাদই উপন্যাসের শেষ অংশে গিয়ে অনেক বেশি সক্রিয় চরিত্রে রূপান্তিত হয়প্ম আসাদ মুনিমের সাথে সাথে লেখক এ উপন্যাসে আরও অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেনপ্ম চরিত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সালমা, রানু, নীলা, বেনু, কবি রসুল, রাহাত, সাহানা, ডলি প্রভৃতিপ্ম ছোট আয়তন বিশিষ্ট এ উপন্যাসের চরিত্র সংখ্যা বেশি হলেও কোনো চরিত্রই অপ্রয়োজনীয় হয়ে উপস্থাপিত হয়নিপ্ম প্রতিটি চরিত্র যার যার দায়িত্ব সক্রিয়ভাবে পালন করেছেপ্ম সব চরিত্রের যথাযথ অবদান উপন্যাসটির আবেদন বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেপ্ম

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

জহির রায়হান নিজে একুশে ফেব্রুয়ারির সাথে যুক্ত থাকার কারণে একুশের চেতনাকে তিনি গভীরভাবে ধারণ করেছিলেন অন্তরেপ্ম এই আবেগ-মিশ্রিত অনুভূতিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে চিত্রিত করেছেন এ 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসেপ্ম ১৯৫২ সালের শহীদদের স্মরণে তারা নানা রকম কর্মসূচী পালন করেপ্ম সরকার ছাত্রদের শহীদ দিবস পালন করতে দিতে নারাজপ্ম এর জন্য সরকার রাস্তায় স্লোগান দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেপ্ম কিন্তু ছাত্ররা দৃঢ়চিত্ত যে তারা যেকোনো মূল্যে শহীদ দিবস পালন করবেপ্ম সে উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করে আসছেপ্ম তাদের কর্ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত- তিন দিন খালি পায়ে হাঁটা, রোজা রাখা, কালো ব্যাজ ধারণ, কালো পতাকা উত্তোলন, স্লোগান দেয়া প্রভৃতিপ্ম শিক্ষার্থীদের শহীদ দিবস পালনের এ ইচ্ছাকে বাস্তবায়নের জন্য মুনিম, আসাদ রাত-দিন কঠোর পরিশ্রম করে যায়প্ম তাদের সাথে সাথে অন্যান্য প্রতিবাদী চরিত্র কবি রসুল, রাহাত, নীলা, সালমা, সাহানা প্রমুখ চরিত্রও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেপ্ম রাজপথে আন্দোলন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করেপ্ম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ আর হল থেকে ছেলেরা এসে বেলা নটা-দশটা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জমা হয়প্ম পুলিশের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয় এবং বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে গ্রেফতার করে জেলগেটের সামনে জড়ো করেনপ্ম এদের সংখ্যা এতো বেশি যে, তাদের নাম ডাকতে ডাকতে ডেপুটি জেলার সাহেব হাঁপিয়ে ওঠেনপ্ম তখন একজন ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে-"এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো"। উপন্যাসটিতে দেশপ্রেমিক আত্মত্যাগী, সংগ্রামী ছাত্রনেতাদের পাশাপাশি সুবিধাভোগী-স্বার্থপর শ্রেণির বর্ণনাও ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেছেন সরকারি গোয়েন্দা মাহমুদ ও বজলের ভেতর দিয়েপ্ম

বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোক ঐতিহ্য নির্ভর গ্রন্থের সমালোচনা

বাঙালির জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার ধারক উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' বিষয়ের বিবেচনায় যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি এর ভাষার আঙ্গিকে উপন্যাসটি বিস্ময়কর রচনাশৈলীর দাবিদারপ্ন তাছাড়া সাবলীল ভাষার ব্যবহার উপন্যাসটিকে জনপ্রিয়তা দিয়েছেপ্ন পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক একাধিক উপন্যাস রচিত হলেও এর গুরুত্ব হ্রাস পায়নিপ্ন রচনার উৎকর্ষে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেপ্ন এর অনাড়ম্বর- জড়তাহীন বাক্যনির্মাণ পাঠককে আকর্ষণ করে উপন্যাস পাঠের জন্যপ্ন ঔপন্যাসিক উপমা, অলঙ্কার, চিত্রকল্প প্রয়োগেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেনপ্ন জহির রায়হান ছিলেন রোমান্টিক চেতনার ধারকপ্ন তাই নানা আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি কয়েকটি প্রণয়কাহিনির ধারাও তিনি রচনা করেছেনপ্ন এসব প্রেমের কাহিনির উপস্থাপনার ফলে পাঠকের কাছে উপন্যাসটি অধিক আকর্ষণীয় হয়েছেপ্ন ডলি-মুনিমের প্রেমের ধারাটি উপন্যাসে সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছেপ্ন মুনিমের প্রেমিকা হলেও সে মুনিমের আদর্শকে ধারণ করতে পারেনি, তাই সে মুনিমের রাজনৈতিক প্রতিবাদী চেতনাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় নাপ্ন ডলি মুনিমকে ত্যাগ করে বজলের প্রেমিকা হওয়ার পথে যাত্রা করে, যদিও এক সময় ডলি নিজের ভুল বুঝতে পেরে মুনিমের চেতনাকে গ্রহণ করে উপন্যাসের শেষ অংশেপ্ন

একুশের ফেব্রুয়ারির চেতনা বাঙালি জাতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং বাঙালি জাতীয়তাবোধে জাগরণ সৃষ্টি করে পরবর্তীকালে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল তারই প্রকাশ এই উপন্যাসপ্ন এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের কারণে বাংলা সাহিত্যের জগতে ভাষা আন্দোলনের দলিল স্বরূপ 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ নিচের বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলো ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন করুন। [৪৪তম বিসিএস]

কেউকেটা; ঘরের শত্রু বিভীষণ; গো-মূর্খ; গড্ডলিকা প্রবাহ; জলে কুমির ডাঙায় বাঘ; সাক্ষী গোপাল।

➲ বাগ্‌ধারাগুলোর অর্থ উল্লেখ করে বাক্যে প্রয়োগ দেখান। [৪৩তম বিসিএস]

অষ্টরম্ভা; ইঁদুর কপালে; কচ্ছপের কামড়; তুলসী বনের বাঘ; গয়ংগচ্ছ; নাটের গুরু।

➲ নিচের বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলো ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্যগঠন করুন। [৪১তম বিসিএস]

জড়ভরত, হাড়-হদ্দ, ডাকাবুকো, সাত ঘাটের কানাকড়ি, উনা ভাতে দুনা বল, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়।

➲ নিচের প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন: [৪০তম বিসিএস]

আমড়া কাঠের ঢেঁকি; শাক দিয়ে মাছ ঢাকা; তামার বিষ; মিছরির ছুরি; ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়; ননীর পুতুল।

➲ নিচের বাগ্‌ধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন: [৩৮তম বিসিএস]

অক্কা পাওয়া, তালপাতার সেপাই, চাঁদের হাট, তাসের ঘর, সাক্ষী গোপাল।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ নিচের প্রবাদ-প্রবচনের সাহায্যে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন: [৩৭তম বিসিএস]

হরিষে বিষাদ, সুলুক সন্ধান, মন না মতি, সোনার কাঠি রূপোর কাঠি, ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।

➲ নিচের প্রবাদ-প্রবচনের অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন: [৩৬তম বিসিএস]

উড়নচণ্ডী, খণ্ড প্রলয়, আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া, যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে, একাদশে বৃহস্পতি, আটে-পিঠে দড় তবে ঘোড়ার উপর চড়।

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০৬

টপিক:
প্রাচীন যুগ, যুগ বিভাগ ও চর্যাপদ, অন্ধকার যুগ, ডাক ও খনার বচন।
গ্রন্থ-সমালোচনা–২: (ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত গ্রন্থের সমালোচনা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক গ্রন্থের সমালোচনা)

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

- বাংলা সাহিত্যের যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

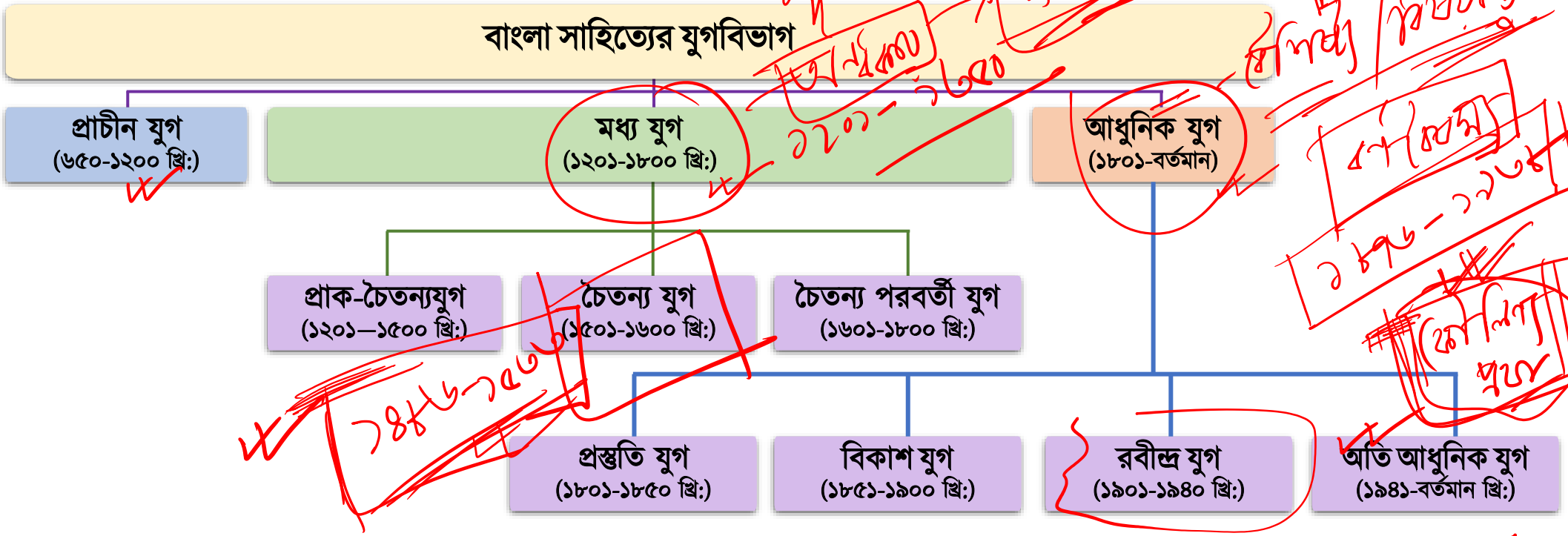

যুগ	বৈশিষ্ট্য
প্রাচীন যুগ	গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ও ধর্মনির্ভরতা
মধ্যযুগ	ধর্মনির্ভরতা
আধুনিক যুগ	মানবের জয়জয়কার, আত্মচেতনা ও জাতীয়তাবোধ

প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০ খ্রীঃ / সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) প্রায় ৫৫০ বছর।

ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ৯৫০-১২০০ খ্রীঃ / দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী প্রায় ২৫০ বছর।

সুকুমার সেনের মতে দশম হতে মধ্য চতুর্দশ শতাব্দী

** প্রাচীন যুগের সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল – **ধর্ম**
** প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যের নিদর্শন – চর্যাপদ

প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

চর্যাপদঃ

বাংলাদেশের আদি সাহিত্য চর্যাপদ যা হাজার বছর আগে রচিত হয়েছে এবং হাজার বছর পর আবিষ্কৃত হয়েছে।

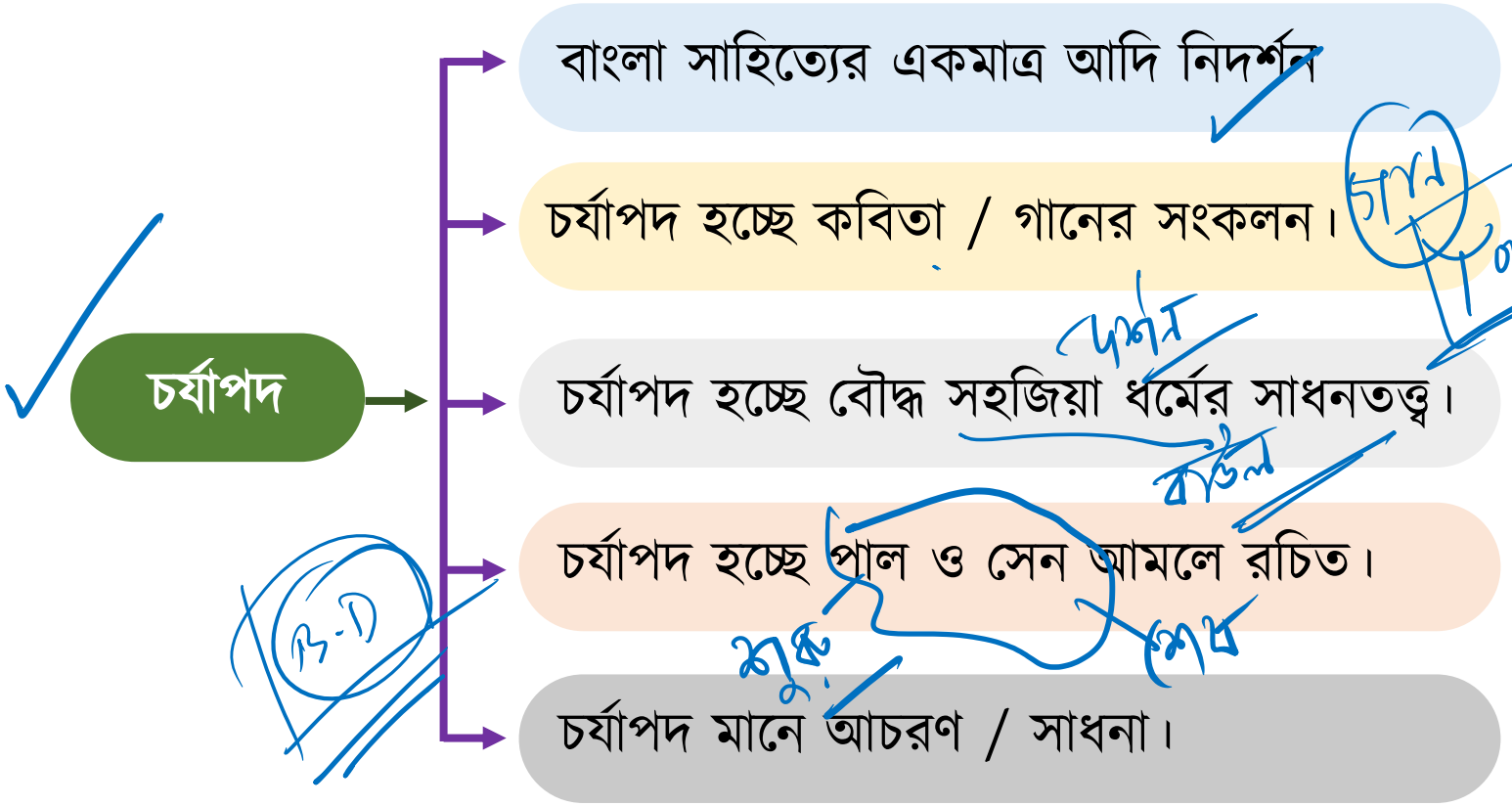

চর্যাপদের নামকরণঃ

- ✓ আশ্চর্যচর্যচয়
- ✓ চর্যাচর্যবিনিশ্চয়
- ✓ চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়
- ✓ চর্যাগীতিকোষ
- ✓ চর্যাগীতি

প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

চর্যাপদ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপটঃ

- ১৮৮২ সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে নেপালে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন।
- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী **১৯০৭ সালে নেপালের রয়েল লাইব্রেরী** থেকে একসঙ্গে ৪ টি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। এর একটি হচ্ছে **চর্যাপদ।**
- বাকী ৩টি হচ্ছে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত

  ১. সরহপদের দোহা

  ২. কৃষ্ণপদের দোহা

  ৩. ডাকার্ণব
- উল্লেখিত ৪ টি গ্রন্থ একসঙ্গে কলিকাতার **"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ"** থেকে প্রকাশিত হয় **১৯১৬ সালে**।
- তখন চারটি গ্রন্থের একসঙ্গে নাম দেওয়া হয় **হাজার বছরের পুরোনো বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা**

চর্যাপদ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপটঃ

- **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** ১৯২৬ সালে **The Origin and Development of Bengali Language** গ্রন্থে চর্যাপদ এর ভাষা বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন।
- ১৯২৭ সালে শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (Buddhist Mystic Songs) গ্রন্থে চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব** বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন যে চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন।

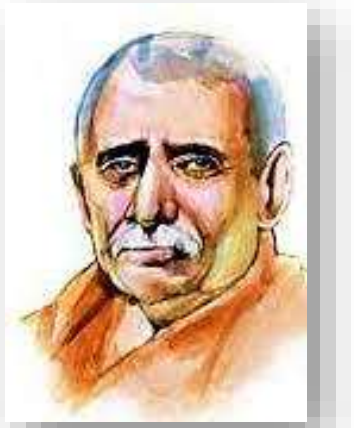

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

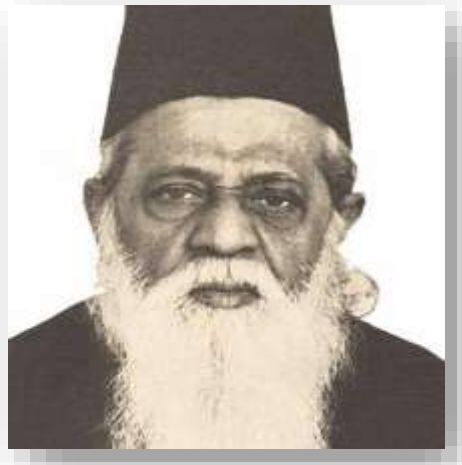

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

চর্যাপদের ভাষাঃ

- চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত- তবে **হিন্দি, মৈথিলী, অসমিয়া, সংস্কৃত** ভাষার প্রভাব রয়েছে।
- ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ ভাষাকে সান্ধ্য ভাষা / **সন্ধ্যা ভাষা / আলো আঁধারের ভাষা** বলেছেন।
- ড. মহাম্মদ শহীদুল্লহ এ ভাষাকে **বঙ্গকামরূপী** ভাষা বলেছেন।
- চর্যাপদে একবচন ও বহুবচনের কোনো পার্থক্য নেই।
- শ, স, ষ বর্ণে পার্থক্য নেই।
- ছন্দ: চর্যাপদ মূলত **পয়ার ও ত্রিপদী** ছন্দে রচিত। তবে আধুনিক ছন্দ বিচারে **'মাত্রাবৃত্ত'** ছন্দে রচিত।

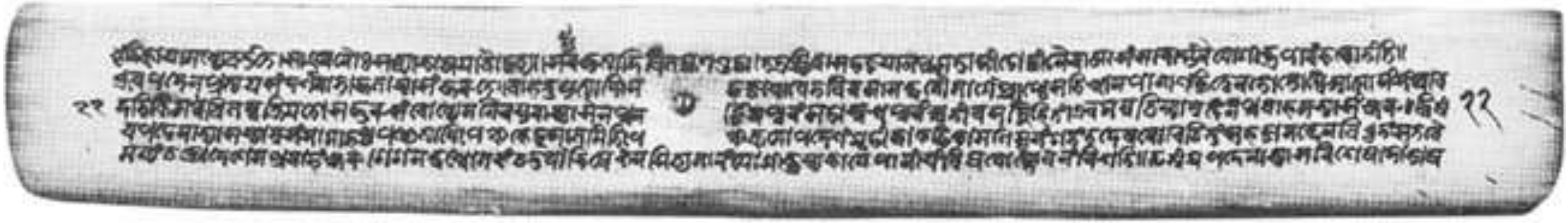

চর্যাপদের কিছু লাইন

প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

চর্যাপদের পদসংখ্যা:

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে-**৫০টি**

সুকুমার সেনের মতে-**৫১টি**

চর্যাপদের পদকর্তা:

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর-**২৩ জন**

সুকুমার সেনের-**২৪ জন**

পদকর্তাগণ

লুই, শবর, কক্কুরী, বিরুআ, গুণ্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন, কামলি, ডোম্বী, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, আজদেব, ঢেণ্ডণ, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জঅনন্দি, ধাম, তন্ত্রী ও লাড়ীডোম্বী।

চর্যাপদ নিয়ে মতভেদ

চর্যাপদের আদি কবিঃ

- চর্যাপদের প্রথম পদের রচয়িতা – **লুইপা** (আদি কবি)
- শহীদুল্লাহর মতে, প্রাচীন কবি **শবরপা**।

চর্যাপদ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্যঃ

- চর্যাপদের আধুনিক কবি – সরহপা
- চর্যাপদের বাঙ্গালি কবি – ভুসুকুপা
- চর্যাপদের নারী কবির নাম- কুক্কুরীপা।
- নবচর্যাগীতি নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন **ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত**। এতে পদ আছে ১০১টি।
- **চর্যাপদের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন হাসনা জসীম উদ্‌দীন মওদুদ। বইটির নাম 'মিস্টিক পোয়েট্রি অব বাংলাদেশ'।**

প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

চর্যাপদের কবিঃ

লুইপাঃ

- চর্যাপদের আদিকবি।
- রচিত পদের সংখ্যা ২ টি।
- **'অভিসময়বিভঙ্গ'** গ্রন্থের রচয়িতা।
- তিনি রাঢ় অঞ্চলের লোক ছিলেন।

চর্যাপদের ভাষা (প্রথম পদ):

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥

কাহ্নপাঃ

- কাহ্নপার রচিত মোট পদের সংখ্যা ১৩ টি।
- **তিনি সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন।**
- তার রচিত ২৪ নং পদটি পাওয়া যায়নি।
- কাহ্নপা সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধযোগী। তিনি ধর্মশাস্ত্র ও সঙ্গীত শাস্ত্র উভয় দিকেই দক্ষ ছিলেন।

ভুসুকুপাঃ

- পদ সংখ্যা **৮টি**।
- মনে করা হয় অষ্টম থেকে এগার শতকে ভুসুকুপা সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রিয় **রাজপুত্র** ছিলেন।
- তাঁর ৪৯নং পদে পদ্মা (পঁউআ) খালের নাম আছে। 'বঙ্গাল দেশ' ও 'বঙ্গালী'র কথা আছে।
- ডা. মুহাম্মদ শহীদুল্লার মতে তিনি পর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।
- তিনি নিজেকে **বাঙ্গালি কবি** বলে দাবি করেছেন।

আপনা মাংসে হরিণা বৈরী,

অর্থ – হরিণ নিজেই নিজের শত্রু

প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)

চর্যাপদের কবিঃ

কুক্কুরীপাঃ

- পদ সংখ্যা ৩টি
- চর্যাপদের **নারী কবি**।

"দিবসহি বহূড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই।।"

ঢেগুণপাঃ

- তিনি পেশায় ছিলেন তাঁতি।
- ঢেগুণপা রচিত পদে তৎকালীন সমাজপদ রচিত হয়েছে।

টালত মোর ঘর নাই পড়বেশী
হাঁড়িতে ভাত নাই নিতি আবেশী

শবরপাঃ

- ড. শহীদুল্লাহ্ শবরপাকে লুইপার গুরু বলে উল্লেখ করেন।
- গবেষকগণ তাকে **বাঙ্গালি কবি** হিসেবে চিহ্নিত করেছেন

চর্যাপদে লাড়ীড়োম্বীপার কোনো পদ পাওয়া যায়নি।

সাহিত্যিক মূল্যে চর্যাপদ

সাহিত্য হলো সমাজের দর্পণস্বরূপ। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন বিষয় সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। তেমনিভাবে চর্যাপদ নামক সাহিত্যিক গ্রন্থটিতে তৎকালীন প্রাচীন সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মের কথা চমৎকার ভাষাশৈলীতে বর্ণনা করা হয়েছে। চর্যাকারেরা সচেতনভাবে কোনো কাব্যসৃষ্টি না করলেও এর যে স্বতঃস্ফূর্ত রসের আবেদন, তা একে কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। চর্যাপদ বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, চর্যাপদে বিভিন্ন রূপকের ব্যবহার রয়েছে। এই রূপকই মাঝে মাঝে একে কাব্য গৌরব দান করেছে। মুহম্মদ আবদুল হাই এর মতে, চর্যার সাহিত্য মূল্য পর্যালোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে, রূপক সৃষ্টিতে পদকর্তাগণ যেখানে লোকায়ত জীবনকে আশ্রয় করেছেন, সেখানে তা সাহিত্যগুণ সম্পন্ন হওয়ার অবকাশ লাভ করেছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তৎকালীন দৈনন্দিন জীবনে সুন্দর সুন্দর ছবি কবিত্বপূর্ণ ভাষায় চিত্রায়িত হয়েছে। যেমন-

ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।।

পরিমিত প্রকাশভঙ্গি যেকোনো শিল্প-সাহিত্যিকেরই পরমকাম্য। এ ব্যাপারে চর্যাগীতিকারদের একটি হরিণের ট্রাজেডির স্মরণ করা যায়- 'আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী'। এখানে খুব অল্প কথায় হরিণের নিজের মাংস নিজের বিপদের কারণ এটা প্রকাশিত হচ্ছে।

দুঃখানুভূতির অভিব্যক্তিও সাহিত্যগুণ সম্পন্ন হয়ে চর্যায় বর্ণিত হয়েছে। আবার সমাজ ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদও আধুনিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঢেণ্ডণের পদে দেখা যায় – "টালত মোর ঘর নাহি পরবেষী। হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।" (পদ ৩৩, অর্থাৎ- টিলার উপর আমার ঘর, কোনও প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতেও ভাত নেই, তবু নিত্য অতিথি আসে।)

চর্যাকারগণ সচেতনভাবে কাব্য রচনা করেননি, তাঁদের বিশেষ রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের গূঢ় ভজনাবলি হলেও, এতে স্বতঃস্ফূর্ত রসের আবেদন এবং বাক্‌নির্মিতির শিল্পকৌশল বিদ্যমান থেকে তাকে কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

চর্যাপদের সমাজচিত্র

চর্যাপদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা। ধর্মতত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে যেসব উপমা ও উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে তৎকালীন সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সমগ্র পূর্ব ভারতের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত উপমা ও রূপকল্পগুলো তৎকালীন বাংলার সমাজজীবন, সাংস্কৃতিকজীবন, পারিবারিকজীবন ও প্রাকৃতিক উপাদান থেকে সংগৃহীত। ডোম, শবর, চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার নানা তথ্য এই পদগুলো থেকে জানা যায়। আবার পারিবারিক জীবনের আচার ও অনাচার উভয়ই সমান দক্ষতায় ফুটে উঠেছে চর্যার পদগুলোতে। সে যুগের খেলাধুলা, নৃত্য, গীত ও আমোদ-প্রমোদের চিত্রও চর্যাকারগণ নিপুণ হাতে এঁকেছেন।

চর্যাপদগুলো নদীমাতৃক বাংলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাঁকো, কেড়ুয়াল, গুণ টানা, দাঁড় টানা, পাল তোলা, সেঁউতি, কাছি, উজান বাওয়া প্রভৃতি বারবার চর্যায় উল্লিখিত। তাছাড়া সে যুগের ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড, সাজসজ্জা, তৈজসপত্র, বাদ্যযন্ত্র, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, খাদ্যপানীয় সবই চর্যার গানগুলোতে টুকরো টুকরো ছবির আকারে ধরা পড়েছে। মূলত চর্যাগীতিগুলো ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে তৎকালীন জীবনের অনেক বাস্তবচিত্র এতে পাওয়া যাবে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্ত্যজ জীবনের পরিচয় রূপায়িত হয়েছে। চর্যাপদে বর্ণিত সমাজচিত্র তৎকালীন বাংলা ও বাঙালির জীবন ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

চর্যাপদে বিধৃত বাঙ্গালি জীবনের পরিচয়

চর্যাপদের মূল উদ্দেশ্য একটি বিশেষ ধর্মীয় আচরণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়া হলেও চর্যাকারেরা সে সময়ের লৌকিক জীবনের যে ছবি এঁকেছেন তা জীবনরসিক কাব্যপাঠক এবং ঐতিহাসিকের কাছে মহামূল্যবান। এই গ্রন্থে আছে সেকালের ছোটবড় সাধারণ লোকের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ও দৈনন্দিন আচরণের সুন্দর বর্ণনা। আছে সেযুগের সাধারণ লোকের জীবন ও জীবিকা, শ্রম ও বিশ্রাম, কাজ ও আনন্দ, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর কারণ, পূজা-আর্চা ক্রিয়াকর্ম, গৃহস্থের পারিবারিক জীবন, বস্ত্র অলংকার, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত খাদ্য ও বাসনপত্র, অপরাধ ও বিচার পদ্ধতি, সংগীত ও সংগীতের উপকরণ ইত্যাদি বহু বিষয়ের শুদ্ধ শিল্পসম্মত বিবরণ। বেশির ভাগ চর্যাগীতিতেই ডোম-ডোমনী, শবর-শবরী, নিষাদ, কাপালিক ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। ডোম, নিষাদ, শবর ইত্যাদি নিচুজাতের লোকজন গ্রামের বাইরে উঁচু যায়গায় বাস করত। নগরের বাহ্মণরা তাঁদের স্পর্শ করত না। ডোমদের জাতিগত বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা, চাঙ্গারী বোনা, নৌকা বাওয়া। প্রাচীনকাল হতে বর্তমান অবধি ভাতই যে বাঙ্গালির প্রধান খাদ্য তা চর্যাপদেও উল্লেখ আছে। যেমন-

“টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেসী”।

গার্হস্থ্য সৌন্দর্যের কথাও চর্যাপদে উল্লেখ আছে। বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনে দুধ, গোরু ও বলদের যে একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল তাঁর প্রমাণ চর্যাপদে পাওয়া যায়। চাষাবাদের জন্য গৃহস্থ বাড়িতে বলদ থাকতো। গাই থাকতো দুধ যোগানোর জন্য, দুধ ধোয়ার জন্য আবার বিশেষ ধরনের পাত্রও থাকতো। গোরু দিনে তিনবার দোয়ানো হতো। নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরার বিবরণের পাশাপাশি মাংস খাওয়ার কথাও বহু যায়গায় রয়েছে। মাংসের মধ্যে প্রিয় ছিল হরিণ, চর্যাপদে কোন ফলের উল্লেখ না থাকলেও তেঁতুলের উল্লেখ পাওয়া যায় ২ নং পদে (রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাঅ) মদ্যপানের বর্ণনা, শুড়িখানায় যাওয়ার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় ৩ নং পদে। আমোদ প্রমোদের উপাদান হিসেবে দাবা খেলার উল্লেখ পাওয়া যায় ১২ নং পদে। নৃত্যগীতের কথা আছে ১০ নং পদে। নাচগানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের কথাও আছে ১৭ নং পদে। সমাজের বিভিন্ন আচার -অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে ১৯ নং পদে। সেকালের যৌতুক প্রথার কথা বলা আছে ২৮ নং পদে। রমণীদের নানারকমের অলংকারের কথা আছে ২৮ নং পদে। আয়নার ব্যবহারের কথা বলা আছে ৪৯ নং পদে। এছাড়াও যৌথ পরিবার ও সামাজিক অঞ্চলের কথাও উল্লেখ আছে। ধনী অভিজাতরা সমাজের কেন্দ্রে বাস করতো আর নিম্নবর্গের প্রান্তিকেরা বাস করত টিলায়। চর্যাপদে তাদের দৈন্য-দুঃখ ও করুণ জীবনের পরিচয় মেলে।

অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০)

অন্ধকার যুগের সাহিত্য নিদর্শন

তথাকথিত অন্ধকার যুগের সাহিত্যের ব্যাপক নির্দশন পাওয়া না গেলেও অন্যান্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির যে সকল নির্দর্শন পাওয়া যায় তাতে এই যুগকে অন্ধকার যুগ বলা শোভনীয় নয়। এ যুগের সাহিত্যের নির্দশন গুলো হলো-

১। প্রাকৃত ভাষার গীতিকবিতার সংকলন গ্রন্থ 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'।

২। রামাই পণ্ডিত রচিত 'শূন্যপুরাণ' এবং এর 'কলিমা জালাল' ও 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামক কবিতা।

৩। হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া'।

৪। ডাক ও খনার বচন।

➲ তবে এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক নিদর্শন পাওয়া না গেলেও অন্যান্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন বর্তমান থাকাতে কোন কোন পণ্ডিত যেমন: **ড. এনামুল হক, ড. আহমদ শরীফ** ও **ড. ওয়াকিল আহমদ** অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

ডাক ও খনার বচন

➲ ডাকের বচন

জ্যোতিষ শাস্ত্র, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও গৃহস্থালী সম্পর্কিত ছড়া ডাকের বচন নামে পরিচিত। ডাক তিব্বতীয় ভাষার শব্দ। যার অর্থ – 'বৌদ্ধিক তান্ত্রিক সাধক' বা প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। ডাকের বচনগুলো আসামের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে রচিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেন ডাক ও খনার বচন রচনার কাল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক বিবেচনা করেছেন। 'ডাক' বর্তমানে উড়িষ্যায় গীত হয়। চর্যাপদের সাথে আবিষ্কৃত হয়েছিল 'ডাকার্ণব' যার অর্থ 'জ্ঞানসাগর'।

ডাকের বচনের উদাহরণ:

নিয়ড় পোখরী দূরে যায়।
পথিক দেখিয়া আউরে চায়।।
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাকে বলে এ নারী ঘরে না টিকে।।

ডাক ও খনার বচন

➲ খনার বচন

কৃষিজ/কৃষিতত্ত্ব ও আবহাওয়া বিষয়ক উপদেশাত্মক এক প্রকার প্রচলিত ছড়া 'খনার বচন' নামে পরিচিত। খনা তিব্বতী ভাষার শব্দ যার অর্থ বোবা। খনার বচনই আমাদের প্রাচীন কৃষি বিজ্ঞান। কেউ কেউ অবশ্য ডাক ও খনার বচন এ দুটিকে প্রাচীন যুগের সৃষ্টি বলে ধারণা করেছেন। ড. আবদুর গফুর সিদ্দিকীর মতে, খনার বচনের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ।

খনার বচনের উদাহরণ:

১. খনা ডাক দিয়া বলে।
চিটা দিলে নারিকেল মূলে।।
গাছ হয় তাজা মোটা।
শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা।।
নারিকেল গাছে লুনে মাটি।
শীঘ্র শীঘ্র বাধে গুটি।।

২. "কলা রোয়ে না কেটো পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।।"

৩. "দিনে রোদ রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল।।"

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থ "চিলেকোঠার সেপাই" এর গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থের নাম	:	চিলেকোঠার সেপাই	প্রকাশক	:	ইউ পি এল
লেখক	:	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	পৃষ্ঠা	:	১৫০
প্রকাশকাল	:	১৯৮৬	মূল্য	:	২০০ টাকা

বাঙালি জীবনের রাজনৈতিক পটভূমিকে উপজীব্য করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা করেছেন 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাস। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসটি লেখকের একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখালেখি শুরু করে স্বল্প সংখ্যক লেখনীর মাধ্যমে বাংলা কথাসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্মের মধ্যে রয়েছে 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৬), ও 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) উপন্যাস। এছাড়াও তিনি অনেক ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সংকলন করেন। জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছেন সাহিত্যকর্মে তিনি তাই রূপায়ণ করেছেন।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থ "চিলেকোঠার সেপাই" এর গ্রন্থ সমালোচনা

ষাটের দশকের পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও আন্দোলনের ধারক 'চিলেকোঠার সেপাই' তবে প্রেক্ষাপট মূলত ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ববর্তী রূপটি ফুটে উঠেছে, যেখানে ব্যক্তি মানুষকে ছাপিয়ে ইতিহাস ও জনপদই নায়ক হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ইব্রাহিম শেখের পুত্র ওসমান, যার ছোটবেলায় ডাকনাম ছিল রঞ্জু। আবার সে বর্তমানে যেখানে থাকে সেখানকার অন্য এক ভাড়াটিয়া পরিবারের কিশোর ছেলের নামও রঞ্জু। এই রঞ্জুর মধ্যে সে আত্মপ্রতিকৃতি আবিস্কার করে ও অতীত কল্পনা করে। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র ওসমানের বন্ধু আনোয়ার, আলতাফ এবং বস্তির বাসিন্দা শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি খিজির ওরফে হাড্ডি খিজির। উপন্যাসের শুরুতেই মাওলানা ভাসানীর ঢাকা স্ট্রাইকের মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় আবু তালেব। ঢাকা শহরের বিভিন্ন শ্রেণি ও অংশের মানুষের মধ্যে এই মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া থেকে বিভিন্ন চরিত্রের অবস্থানও বোঝা যায়। ছাত্ররা স্লোগান দেয় তারা লাশ চায়- "শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না" কিন্তু বাড়ির মালিক 'মৌলিক গণতন্ত্রী' মাথায় কালো জিন্নাহ টুপি পড়া রহমতউল্লাহ দ্রুত কাফন-দাফনের কাজ করতে চায়। দারোগাও তাই চায়।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থ "চিলেকোঠার সেপাই" এর গ্রন্থ সমালোচনা

তাই পুলিশের ভ্যানে করে তালেবের লাশ ছাত্রদের প্রতিবাদের মুখে কবর দেওয়া হয়। উপন্যাসের নায়ক আসলে ১৯৬৯ সাল নামক সময়। এ সময়টিকে ধারণ করে তৎকালীন পূর্ববাংলার ঐতিহাসিক গণজাগরণ। ইতিহাসের এ সময়কে চিত্রিত করতে আন্দোলিত সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে অনেক চরিত্রকে তুলে ধরেছেন লেখক। সেই সময়ের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে উপন্যাসে মিছিল ও রাজনীতির ব্যাপক বিস্তার দেখা যায়। '৬৯-এর তৎকালীন রাজনীতির একটি স্রোতধারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে উৎসারিত। পাকিস্তানি শাসক- শোষকদের হাত থেকে নিজেদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের কণ্ঠে স্লোগান ওঠে- "তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা, জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব, জাগো জাগো বাঙালি জাগো' ইত্যাদি।

গ্রামের মানুষের আন্দোলনে শ্রেণি সংগ্রামের পটভূমি আঁকার চেষ্টা করেছেন লেখক। এখানে ভিন্ন ভিন্ন জীবন ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা। জমির জালিয়াতি, সুদের অত্যাচার, বর্গাচাষির অসহায় আর্তনাদ, পরজীবী টাউট আর জোতদারদের জীবনযাপন, গরিবদের মধ্যে কুসংস্কারের আধিক্য, ধর্মের যোগান সবই আসে আলোচনায়। বাম আন্দোলনের কর্মী আনোয়ারদের মতো মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং জনগণের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ শ্রেণি সংঘাতে পরিণত হয়। গ্রামীণ জীবনের এ কাহিনিস্রোতে রয়েছে আনোয়ার, প্রতিবাদী চেংটু, করমালী, আলিবক্স এবং খয়রার গাজী। ঊনসত্তরের সংগ্রাম ও মিছিলে তরঙ্গিত ঢাকায় জন মানসে ব্যাপক জাগরণ ঘটে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থ "চিলেকোঠার সেপাই" এর গ্রন্থ সমালোচনা

আইয়ুব খানকে উৎখাত করে সামরিক শাসনে শৃঙ্খল থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে নিম্নবিত্তের সবাই গণবিদ্রোহে সাড়া দিয়েছিলপ্ম শহরে, হোটেলে ছাত্রকর্মীরা যখন প্রবল রাজনৈতিক বিতর্কে ব্যস্ত তখন সেখানে এসে বস্তির বাচ্চারা আইয়ুব খানের ছবি লক্ষ করে ঢিল মারে। ছবি নামিয়ে ফেলার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। উপন্যাসে বস্তির রিকশাচালক হাড্ডি খিজিরের মুখ থেকে তার ভেতরের আসল স্বপ্নের কথা জানা যায়। আইয়ুব খানের পতনই তাদের মূল আকাঙ্ক্ষা নয়। খিজির ভাবে আইয়ুবের পতন হলে রিকশার মহাজন রহমতউল্লাদেরও পতন হবে। যে রহমতউল্লাহ তার জন্মকে আজন্ম পাপে পরিণত করেছে। তার জীবনকে স্বপ্নহীন করে তুলেছে। সেই মহাজনের পতন আর আইয়ুবের পতন এক করে দেখে গণআন্দোলনে তারা মিছিল করে। আলাউদ্দিন মিয়ার রিকশার গ্যারেজ থেকে রাজপথের মানুষের সাথে মিছিল করে স্লোগান দিতে তার ভালো লাগে। "আইয়ুব শাহী মোমেনশাহী ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক, আইয়ুব মোমেন ভাই ভাই এক দড়িতে ফাঁসি চাই"।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থ "চিলেকোঠার সেপাই" এর গ্রন্থ সমালোচনা

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে লেখক গ্রামকে নিয়ে এসেছেন একটি চিঠির সূত্র ধরে। চিঠিটি আনোয়ারকে লেখা। কলেজ শিক্ষক, মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আনোয়ার বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী, যে আন্দোলনের মধ্যে জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণ রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরোধিতা করে গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে। কিন্তু উপন্যাসে তার কোনো সাংগঠনিক অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। সে গ্রামে যায় কিন্তু কীভাবে কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী যায় তা জানা যায় না। মনে হয় সে একা বিচ্ছিন্নভাবে এ কাজে ব্রতী হয়েছে। সে ঠিক মতো দাঁড়াতে পারে না ও তার অবস্থানও পরিষ্কার না। গ্রামীণ জীবনের শ্রেণি সংগ্রামে খয়রার গাজী ও আফসার গাজীর শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আনোয়ার। চেংটু, করমালি ও খোদাবক্স, স্থানীয় জমিজমা ও সম্পত্তির মালিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। কিন্তু তাদের এ প্রতিবাদ ধরে রাখা যায়নি। অন্তর্নিহিত দুর্বলতা তাদেরকে ভেতর থেকে কাবু করে ফেলে। এই সুযোগে বাঙালির ঐক্যের নামে খয়রার গাজীরা নিজেদের জায়গায় আবার ফিরে যায়।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থ "চিলেকোঠার সেপাই" এর গ্রন্থ সমালোচনা

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বিষয় ভাবনার বৈচিত্র্যের সাথে শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সাথে ওসমানের দৃষ্টিকোণকে এক করে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক। ৬৩টি পরিচ্ছেদে রচিত উপন্যাসটির প্রতিটি পরিচ্ছেদ স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তির আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসন্ধানের প্রয়োজনে লেখক ইতিহাস, রাজনীতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে একত্রে তুলে এনেছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মহাকবির মতো ছোট ছোট কাহিনি যুক্ত করে সুন্দর সম্মিলনের মাধ্যমে এ উপন্যাসকে মহাকাব্যিক রূপ দিয়েছেন। চরিত্রগুলোকে তিনি স্ব স্ব সামাজিক অবস্থান মূল্যবোধ, আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব সংঘাত সবকিছু মিলে অদ্ভুত স্বচ্ছতার মাধ্যমে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। মনে হয় যেন সব জীবন্ত মানুষ সামনে উপস্থিত সব ঘটনায় যা একের পর এক ঘটে যাচ্ছে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থ "চিলেকোঠার সেপাই" এর গ্রন্থ সমালোচনা

উপন্যাসের নামকরণে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে ওসমান মৃত খিজিরের আত্মাকে প্রণোদনা দেয়। সে সিজোফ্রেনিয়াগ্রস্ত হয়ে ঘরের বন্দিত্ব, চিত্তের শৃঙ্খল ভেঙ্গে কোথায় যেতে চায় তা লেখক সরাসরি বলেননি। লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন মধ্যবিত্তের দৌরাত্ম্য, চিলেকোঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ পর্যায়েই লেখক উপন্যাসের নামকরণ করে ওসমানকে মূল চরিত্র করে তোলেন। মধ্যবিত্তের 'হিপোক্রেসি'কে লেখক এভাবে ব্যঙ্গ করে তাদের নতুন করে জেগে ওঠার আহ্বান করেন। উপন্যাসটিতে লেখক প্রমিত বাংলার সাথে পুরাণ ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে ঢাকার ভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষা সাবলীলভাবে প্রয়োগ করেছেন। উপমা ব্যবহারে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাবলীলতা ধরা পড়ে এ উপন্যাসে। তবে শিল্পের প্রকরণগত ধারায় লেখক তাঁর এ উপন্যাসটিকে সাজাননি। তাছাড়া 'এ্যাবসার্ডধর্মিতা' লক্ষ্য করা যায় 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে।

গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে আহমদ ছফা রচিত উপন্যাস 'ওঙ্কার' যেমন ঊনসত্তরের উত্তাল সময়ে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির টানাপোড়েন তুলে ধরা হয়েছে, ঠিক তেমনি 'চিলেকোঠার সেপাই' গ্রন্থে ঔপন্যাসিক একইসাথে শহরে ও গ্রামীণ জনপদে অভ্যুত্থানের উত্তাপ কতটা ছড়িয়ে পড়েছিল তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থ "চিলেকোঠার সেপাই" এর গ্রন্থ সমালোচনা

ঊনসত্তরকে না বুঝলে একাত্তরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ঊনসত্তর এবং একাত্তরের এই প্রভেদ বোঝা দরকার নানা কারণেই। বিশেষত, ঊনসত্তরের মূল পাটাতন নির্মাতাদের হারিয়ে যাওয়া আর আরেক শক্তির উত্থান বোঝা জরুরি। ঊনসত্তরকে যারা বুঝতে চান তাদের জন্য আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এই উপন্যাস। ঊনসত্তরকে বোঝার জন্য এমন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল। একে ঊনসত্তরের মহাকাব্য বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থ "জোছনা ও জননীর গল্প" এর গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থের নাম	:	জোছনা ও জননীর গল্প	প্রকাশক	:	অন্যপ্রকাশ
লেখক	:	হুমায়ুন আহমেদ	পৃষ্ঠা	:	৫২৭
চলচ্চিত্রায়ণ	:	২০০৮	মূল্য	:	৬০০ টাকা
প্রকাশকাল	:	ফেব্রুয়ারি, ২০০৪			

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত 'জোছনা ও জননীর গল্প' একটি অনবদ্য উপন্যাস। উপন্যাসটিতে অনেকগুলো চরিত্রের সুনিপুণ উপস্থাপনার মাধ্যমে ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

'জোছনা ও জননীর গল্প' এর রচয়িতা নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ। তার লিখিত প্রথম উপন্যাস শঙ্খনীল কারাগার। অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- অপেক্ষা, শুভ্র, দারুচিনি দ্বীপ, শ্যামল ছায়া, আগুনের পরশমণি প্রভৃতি। উপন্যাস ছাড়াও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন- ছোটগল্প, আত্মজীবনী, চলচ্চিত্র ও নাটকে তার অসামান্য অবদান রয়েছে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থ "জোছনা ও জননীর গল্প" এর গ্রন্থ সমালোচনা

মানুষের যেমন পিতৃঋণ-মাতৃঋণ শোধ করতে হয়, দেশমাতার ঋণও শোধ করতে হয়। হুমায়ুন আহমেদের কাছে একজন লেখক হিসেবে সে ঋণ শোধ করা যায় লেখার মাধ্যমে। আর দেশমাতৃকার প্রতি একজন লেখক হুমায়ুন আহমেদের যে ঋণ তা শোধ করার মাধ্যম হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন 'জোছনা ও জননীর গল্প'কে। পাঁচশতের বেশি পৃষ্ঠার এ উপন্যাস যেন মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের এক খণ্ডিত রুপ, যার মাধ্যমে লেখক সে সময়কে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ভূমিকাতেই হুমায়ুন আহমেদ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে 'জোছনা ও জননীর গল্প' কোনো ইতিহাসের বই না। কিন্তু এটা এমন একটা উপন্যাস যে উপন্যাসের কাহিনিকে সাজানো হয়েছে ইতিহাসকে আশ্রয় করে। উপন্যাস হলেও হুমায়ুন আহমেদ চেষ্টা করেছেন ইতিহাসের একেবারে কাছাকাছি থাকার। সে অর্থে 'জোছনা ও জননীর গল্প' আমার মতে উপন্যাসের আদলে গড়া ইতিহাসের দলিল।

'জোছনা ও জননীর গল্প' এর শুরুটা ফাল্গুন মাসের শুরুতে, তার মানে ১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে, যখন নীলগঞ্জ হাইস্কুলের আরবি শিক্ষক মাওলানা ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরী তার ছোটভাই শাহেদ, ভাইয়ের বউ আসমানী আর ভাইয়ের মেয়ে রুনিকে দেখতে ঢাকা আসেন। মাওলানা ইরতাজউদ্দিন, শাহেদ, আসমানী আর তাদের ঘিরে থাকা মানুষজনদের নিয়ে 'জোছনা ও জননীর গল্প'।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থ "জোছনা ও জননীর গল্প" এর গ্রন্থ সমালোচনা

এত বড় একটা উপন্যাসের চরিত্র চিত্রায়ন করা খুব কঠিন কাজ। এত বড় উপন্যাস হিসেবে এর প্রধান প্রধান চরিত্রের নয় মাসের উত্থান-পতন যেন ভূমিকায় লেখা হুমায়ুন আহমেদের সেই লেখাটাই মনে করিয়ে দেয়ঃ 'সে বড় অদ্ভুত সময় ছিল। স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের মিশ্র এক জগত। সবই বাস্তব, আবার সবই অবাস্তব।' তাইতো মনটা আপ্লুত হয় যখন মাওলানা ইরতাজউদ্দিন বলে ওঠেন 'যা বলতেছি চিন্তাভাবনা করে বলতেছি। এখন থেকে আমি জুম্মার নামাজ পড়ব না। পরাধীন দেশে জুম্মার নামাজ হয় না। নবী করিম (সাঃ) যতদিন মক্কায় ছিলেন জুম্মার নামাজ পড়েন নাই।' পাকিস্তানিদের প্রতি ঘৃণাবোধ প্রবল হয় যখন নামাজ না পড়ানোর অপরাধে মাওলানা সাহেবকে উলঙ্গ করে নীলগঞ্জ বাজারে চক্কর দেয়ানো হয়। গ্রামের একজন হিন্দু লোক সেটা সহ্য করতে না পেরে একটা চাদর এনে ঢেকে দেন মাওলানা সাহেবকে। পরে দুজনকেই সোহাগী নদীর পাড়ে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শাহেদের কাছে পৌঁছায় না। শাহেদকে দেখা যায় স্ত্রী সন্তান হারিয়ে পাগলের মতো শহরের এ মাথা ওমাথা খুঁজে ফিরতে। এভাবেই সে পরিচিত হয় অন্য আরেক পরিবারের সাথে, যাদের বুকেও রয়েছে যুদ্ধের বিশাল ক্ষত। শাহেদের সহকর্মী গৌরাঙ্গকে দিয়ে তৎকালীন সময়ে হিন্দুদের অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগের দৃশ্য আমরা দেখি। সেই সাথে উপলব্ধি করা যায় এক শ্রেণির মানুষের অবস্থা যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করা তো দূরে থাক, নিজের পরিবারকে বাঁচাতেও অক্ষম। তেমন একজন মানুষ গৌরাঙ্গ। অবশেষে তার মৃত্যু হয় মানুষিক যন্ত্রণায়।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থ "জোছনা ও জননীর গল্প" এর গ্রন্থ সমালোচনা

মাওলানা ইরতাজউদ্দিনকে দিয়ে তার সাথের মানুষজনকে, শাহেদকে দিয়ে সে সময়ের কোনো স্বামীকে, গৌরাঙ্গকে দিয়ে হিন্দুদের অবস্থাকে, নাইমুলকে দিয়ে এদেশের মুক্তিকামী যুবকদের, শাহ কলিমের মাধ্যমে সুবিধাভোগী, স্বার্থান্বেষী মানুষকে চিত্রিত করেছেন লেখক। মাওলানা ভাসানী, তাজউদ্দিন, ইয়াহিয়া, জুলফিকার আলী ভুট্টো, নিক্সন, ইন্দিরা গান্ধী এর মতো ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে সময়ের প্রয়োজনে আনা হয়েছে এই উপন্যাসে। এটা যেন পুরো বাংলাদেশের সে সময়কার গল্প। ঢাকার গল্প, নীলগঞ্জের মাধ্যমে গ্রামের গল্প, বরিশাল বা পিরোজপুরের মাধ্যমে নদীমাতৃক বাংলাদেশের গল্প, শরণার্থী শিবিরের গল্প, ভারতের কলকাতার গল্প, অস্থায়ী সরকারের গল্প। এটা যেন মুক্তিযুদ্ধকালীন সাহসী যোদ্ধার গল্প, সুযোগসন্ধানী সুবিধাবাদীদের গল্প, কাপুরুষতার গল্প, বাবার গল্প, ভাইয়ের গল্প, বন্ধুর গল্প, শত্রুর গল্প, মায়ের গল্প, মেয়ের গল্প, বীরাঙ্গনাদের গল্প, শহিদদের গল্প, গাজীদের গল্প।

উপন্যাসে বর্ণিত প্রায় সব ঘটনাই সত্যি। কিছু হুমায়ুন আহমেদের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা যেটা আমরা উপন্যাসের মাঝে প্রায়ই দেখতে পাই। ইতিহাসের যে সময়টার তিনি বর্ণনা করেছেন সে সময় বা তার কাছাকাছি সময়ে তার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা প্রবাহ তিনি তুলে ধরেছেন।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত গ্রন্থ "জোছনা ও জননীর গল্প" এর গ্রন্থ সমালোচনা

কিছু অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে ধার নেয়া। যেটার নির্ঘন্ট বইয়ের শেষে হুমায়ুন আহমেদ দিয়ে দিয়েছেন। জোছনা রাতে চাঁদের আলো আর রাতের অন্ধকার মিলে যেমন নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তার দোলাচালে রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি হরে, তেমনি এক সময় ছিল একাত্তর। তাই জোছনা রাতে জননী মাতৃভূমির সংগ্রামের গল্প হিসেবে উপন্যাসের নাম 'জোছনা ও জননীর গল্প' সার্থক হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের পেক্ষাপটে রচিত সমসাময়িক উপন্যাসগুলোর মধ্যে কাহিনির বিন্যাস ও পরিধির বিচারে 'জোছনা ও জননীর গল্প' অন্যতম বড় লেখনি। একই লেখকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস যেমন: শ্যামল ছায়া, আগুনের পরশমণি ইত্যাদির সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে এটিতে অনেক সত্য কাহিনি, বাস্তব অভিজ্ঞতা উপন্যাসে রূপ পেয়েছে, যেখানে অন্য উপন্যাসগুলো কেবলই কাল্পনিক।

হুমায়ুন আহমেদ সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর সুররিয়েলিষ্টিক সময় পার করে এসে তার খানিকটা ধরতে চেয়েছিলেন এ প্রজন্মের জন্য যাতে তার মানবজীবন ধন্য হয়। 'জোছনা ও জননীর গল্প' পড়ে মনে হয় তার অনেকটাই তিনি ধরতে পেরেছেন।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- চর্যাপদ কবে, কোথায় এবং কে আবিষ্কার করেন। [৪৪তম বিসিএস]
- চর্যাপদের বিধৃত বাঙালিজীবনের পরিচয় দিন। [৪৩তম বিসিএস]
- বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সন্ধ্যা ভাষা' বলা হয়? [Note: সন্ধ্যা ভাষাকে সান্ধ্য ভাষাও বলা হয়।] [৪০তম বিসিএস]
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সন্ধ্যা ভাষা'বলা হয়। [Note: সন্ধ্যা ভাষাকে সান্ধ্য ভাষাও বলা হয়।] [৩৮তম বিসিএস]
- অন্ধকার যুগের সাহিত্যের নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- চর্যাপদে নিম্নবর্গীয় মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার বিবরণ দিন। [৩৬তম বিসিএস]
- চর্যাপদের ভাষা নিয়ে বিদ্যমান বিতর্ক সম্পর্কে আপনার ধারণা লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]
- 'চর্যাপদ' কত সালে এবং কোন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়? [৩৪তম বিসিএস]
- চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন? [৩৩তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়